পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৩ মে ২০১৭

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

মন জিততে হাতের লেখা

বেশিরভাগ সময়ে আমাদের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হল লেখা। পরীক্ষার খাতা, চিঠিপত্র, অফিসের ফর্ম কাগজ কত কিছুর মধ্যে দিয়ে লিখে আমাদের তথ্য বা ভাব বিনিময় করতে হয়। ইন্টারনেট নাকি এমন দিন আনবে যখন মানুষ কিছুই আর হাতে লিখবে না। সবই করবে কম্পিউটার আর ল্যাপটপে। তাই অনেকেই ভাবে হাতের লেখায় মন দিয়ে কী হবে? এ তো শুধু স্কুলের জন্যেই। তার পরে শেষ! কিন্তু সত্যিই কি তাই? জীবনে সেদিন কবে আসবে কেউ জানে না যখন আর হাতে লিখতে হবে না। শুধু তাই নয় হাতের লেখা তো একটা আর্ট। ক্যালিগ্রাফির নাম নিশ্চয় সবাই শুনেছে। হাতের লেখায় তৈরি হয় স্বতন্ত্র পরিচয়। কোনও মানুষের হাতের লেখা দেখে না কি তার চরিত্র বলে দেওয়া যায়। হাতের লেখা তাই অবহেলায় ফেলে রাখার বিষয় নয়। এমন হয়তো দিন আসবে যখন নিজের হাতে কিছু লেখার মর্যাদা আরও বাড়বে। তখন যাদের সুন্দর হাতের লেখা তাদের কদর বাড়বে। এসব ভাবনার কথা হলেও এসব অসম্ভব নয়। তাই হাতের লেখার সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামাতেই হবে। এটা শুধু পরীক্ষায় বেশি নাম্বার পেতেই সাহায্য করবে না, একজন রুচিশীল মানুষের পরিচয় গড়ে তুলবে।

বিশেষজ্ঞরা কতগুলো ছোট ছোট টিপস দেন হাতের লেখা সুন্দর করতে। সেগুলো ভালোই সাহায্য করে।

আলাদা আলাদা কলমের ব্যবহারে হাতের লেখায় চমক আসে। যেমন লেখায় পয়েন্ট করতে জেল পেন, পয়েন্টিং ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে মার্কার পেন এবং স্বাভাবিক লেখার জন্য বলপেন ব্যবহার করা উচিত। বলপেনে বেশ গড়গড়িয়ে লেখা যায়। জেল ও মার্কার পেনে লেখার সৌন্দর্য বাড়ে।

চেপে লেখার অভ্যেস অনেকেরই থাকে। এটা খুব কাজের কথা নয়। এতে দেখতে খারাপ লাগে, উলটো পিঠে ছাপ পড়ে, খাতা ছিঁড়ে যেতে পারে। তার ওপরে পেন বা পেনসিল চেপে ধরলে লেখার গতি কমে যায়। তাড়াতাড়ি হাত ব্যথা হওয়ার ফলে বেশিক্ষণ লেখা যায় না।

ইংরেজিতে কার্সিভ রীতিতে আমরা জড়িয়ে লেখার অভ্যেস করি। তাতে লেখা বেশ একটা সুন্দর ছবির মতো দেখতে লাগে। কিন্তু অনেক সময়েই তাড়াহুড়ো করে বা গাফিলতিতে আমরা একটার সঙ্গে আরেকটা অক্ষর এমনভাবে জড়িয়ে লিখি যে কোনটা কী আলাদা করে বোঝার উপায় থাকে না। এতে পুরো পাতাটা নোংরা লাগে, কিছু কাটাকুটি করতে গেলে জায়গা পাওয়া যায় না। তাই লিখতে গিয়ে লেখা যাতে বেশি জড়িয়ে না যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

লেখার সৌন্দর্য বজায় থাকে এক-রকমের হাতের অক্ষরে। অর্থাৎ তাদের আয়তন ও মাপের মধ্যে যদি একটা সমতা বজায় রাখা যায় তবেই তা ভালো হয়। না বেশি বড়, না বেশি ছোট। মোটামুটি মাঝারি আকার।

হাতের লেখায় পুরো হাতই কাজ করে। যেমন, আঙুল, হাতের পেশি, করতল। সবাইকে সচল রাখা দরকার। অনেক সময় লিখতে লিখতে হাত ঘেমে যায়। এতে পেন বা পেনসিলে হাত পিছলে যায়। তাই হাত শুকনো

এরপর তিনের পাতায়

দুইয়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
পর্বতশৃঙ্গ
তিনের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
ইংলিশ গ্রামার ও বাংলা ব্যাকরণ
চারের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
ভূগোল
ক্লাস এইট-এর টিউশন
বিজ্ঞান
পাঁচের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ভূগোল
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ভৌতবিজ্ঞান
ছয়ের পাতায়
ক্যুইজ ও জেনারেল নলেজ
সাত ও আটের পাতায়
এডু টিপস
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
লিটল বয় ও ফ্যাটম্যান

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

নিজের প্রতিভাকে বিশ্বাস করো

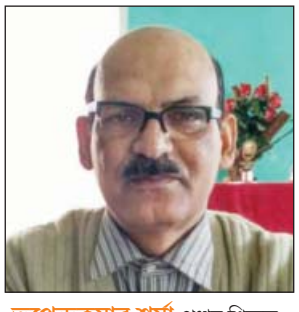

ভূপেন্দ্রকুমার শর্মা প্রধান শিক্ষক, কামাখ্যা বিদ্যালয় হাই স্কুল, মালিগাঁও

প্রথমেই বলব, আজকের ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতের সম্পদ। তাই নিজেকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হল অধ্যবসায় আর স্থির লক্ষ্য। একজন পড়ুয়ার ভবিষ্যতের ভিত তৈরি হয় মাধ্যমিক পর্যায়ে। তাই ক্লাস এইট থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক নিয়ে সিরিয়াস হওয়া উচিত। তবে শুধু পরীক্ষার আগে সিরিয়াস হয়ে লাভ নেই। সারা বছর ভালো করে পড়লে পরীক্ষার আগে তেমন কষ্ট হবে না। ক্লাসে শিক্ষকরা যা পড়ান, বাড়িতে বসে সেগুলি প্র্যাকটিস করতে হয়। শিক্ষকদের কাজই হচ্ছে ছাত্রদের বোঝানো। তাই কিছু না বুঝলে দ্বিধাবোধ না করে শিক্ষককে আবার জিজ্ঞেস করো। সৎ সাহসে শিক্ষকের কাছে নিজের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করো। মনে রাখবে, কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে পড়া মনে রাখা তেমন কঠিন কাজ নয়। মূল বিষয়টা বুঝতে পারলে পড়তেও ভালো লাগবে। তবে শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না। পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধুলো, সাধারণ জ্ঞান, গান-বাজনা সবদিকেই তোমাদের দক্ষ হওয়া উচিত। এবং এর জন্য চাই একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদিকে, প্রতিযোগী মনোভাবও থাকা উচিত ছাত্রছাত্রীদের মনে। তবে তা যেন আক্রোশ না হয়। শুধু পড়াশোনা নয়, সব ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। প্রতিযোগী মনোভাব না থাকলে উন্নতি করার ইচ্ছাও থাকে না। আর একটা কথা সবসময় মনে

এরপর তিনের পাতায়

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

পড়ার জন্য রুটিন তৈরি করে নিয়েছি

সুদেষ্ণা দাস দশম শ্রেণি, হোলি ফ্যামিলি গার্লস হাই স্কুল

সুদেষ্ণার সঙ্গে কথা বললে একটা ব্যাপারই স্পষ্ট হয় যে সে পড়াশোনার ব্যাপারে খুব সচেতন, নিজের লক্ষ্য, স্বপ্ন পূরণের জন্যে কী কী করতে হবে তার পরিকল্পনা তার মাথায় স্পষ্ট। তাই এখন তার ধ্যানজ্ঞান হল নিজেকে প্রস্তুত করা। পড়াশোনার সঙ্গে তার মিষ্টি ব্যবহার ও নম্র, বিনয়ী আচরণ সকলের কাছে তাকে প্রিয় করে রেখেছে।

তার সঙ্গে কথা বলে তার ভাবনা-চিন্তার কিছুটা আভাস আমরা পাওয়ার চেষ্টা করেছি।

উত্তরণ: পড়াশোনা কোনও রুটিন মেনে করো?

সুদেষ্ণা: হ্যাঁ, স্কুলের রুটিনের পাশাপাশি বাড়িতে পড়ার জন্যও নিজের একটা রুটিন করে নিয়েছি। এটা আমিই বানাই। দিন ধরে বিষয় ভাগ করে রেখেছি। এতে আমার বিষয়গুলো সময়মতো স্কুলের আগে পড়া হয়ে যায়। কিছু বাদ পড়লে আমার মনের মধ্যে সেটা চলতে থাকে।

উত্তরণ: তোমার রুটিনে কমন কিছু আছে?

সুদেষ্ণা: অঙ্ক আমি রোজ অভ্যেস করি। দিনে অন্তত ৪৫ মিনিট আমি অঙ্ক করি। আর যখনই নতুন কিছু শিখি আন্ডারলাইন করে রাখি।

উত্তরণ: সারাদিনে কতক্ষণ পড়াশোনা করো?

সুদেষ্ণা: সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে ৬-৯টা পড়ি। এই তিন ঘণ্টা নতুন বিষয় পড়ি, রিভিশন দিই। বিকেলে টিউশন পড়া ৫.৩০-৬টা থেকে থাকে। রাতে আবার ৯-১১টা নিজে পড়ি।

উত্তরণ: নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভেবেছ?

সুদেষ্ণা: ডাক্তার হতে চাই।

উত্তরণ: এর জন্যে কি কোনও বিশেষ প্রস্তুতি নিচ্ছো?

সুদেষ্ণা: আমার জ্যাঠ্য আমায় এন্ট্রান্সের বইপত্র এনে দেন, বলেন কীভাবে কী করতে হবে, কোন কোন পরীক্ষায় আমায় বসতে হবে। সেইমতো প্রস্তুত হতে বলেন। আমিও চেষ্টা করি।

উত্তরণ: পড়াশোনা ছাড়া আর কিছু করো?

সুদেষ্ণা: ছবি আঁকতে আমার ভালো লাগে।

উত্তরণ: বাড়িতে কে বেশি সময় দিতে পারেন?

সুদেষ্ণা: মা মাঝে মাঝেই পড়া ধরেন, বা আমি রিডিং পড়ে শোনাই।

উত্তরণ: খুব ভালো লাগল কথা বলে। শুভেচ্ছা জানাই যেন তোমার ইচ্ছে পূরণ হয়।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৩ মে ২০১৭

জেনারেল নলেজ

পৃথিবীর কিছু বিখ্যাত পর্বত শৃঙ্গ

পৃথিবীর সবথেকে উঁচু অংশ হল পর্বত। পর্বতের চূড়াকে বলে পর্বতশৃঙ্গ। এই পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে যেগুলি উচ্চতম, সেগুলোর কথা আজ জেনে নিই।

মাউন্ট এভারেস্ট

মাউন্ট এভারেস্টের নাম কে না শোনেনি? ছোটবেলায় ভূগোল বইয়ের পাতায় এর সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় সবার। মাউন্ট এভারেস্ট হল একটি পর্বতশৃঙ্গ। এটি হিমালয় পর্বতমালার সবথেকে উচ্চতম শৃঙ্গ। শুধু হিমালয় পর্বতমালা বললে ভুল হবে, এটি পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা মাপা হয় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই শৃঙ্গের উচ্চতা ৮৮৪৮ মিটার, ফুটের হিসাবে বললে ২৯,০২৯ ফুট। এটি হিমালয় পর্বতমালার একটি অংশ। এশিয়ার নেপাল এবং চিনের সীমানার মধ্যে এর অবস্থান। ১৮৫৬ সালে ভারতের বৃহৎ ত্রিকোণমিতিক জরিপ অর্থাৎ Great Trigonomatric Survey প্রকল্পের দ্বারা সর্বপ্রথম এভারেস্টের উচ্চতা মাপা হয়। সেই হিসাবে উচ্চতা হয় ৯০০২ ফুট বা ৮৮৪০ মিটার। যদিও এই সময় এভারেস্ট পরিচিত ছিল Peak-XV অর্থাৎ ১৫ নং চূড়া নামে। এভারেস্ট পর্বত চূড়ার আনুষ্ঠানিক নামকরণ করে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি। ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ জরিপ পরিচালক [British Surveyor General] এন্ড্রু ওয়াহর তত্ত্বাবধানে এই কাজটি সম্পন্ন হয়। ওয়াহ সেই মুহূর্তে কোনও প্রচলিত আঞ্চলিক নাম প্রস্তাব করতে পারেননি। এর পিছনে একটা কারণও আছে, সেই সময় নেপাল ও তিব্বত বিদেশিদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। যদিও তিব্বতিরা একে বহু শতবর্ষ ধরে নিজেদের ভাষায় চোমোলুংমা বলে আসছিল। একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন এভারেস্টে চড়া পর্বতারোহণের কারিগরি দিক থেকে অতটা কঠিন নয়। সেই তুলনায় আট হাজারি অন্যান্য পর্বতশৃঙ্গ যেমন কে২ বা নাঙ্গা পর্বতে চড়া অনেক বেশি কষ্টকর এবং দুঃসাধ্য। তবে এভারেস্টে পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে যে প্রতিকূলতাগুলোর সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি হল উচ্চতা পীড়া, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং বাতাসে অক্সিজেনের অভাব ইত্যাদি। ২০০৮ সালের শেষ পর্যন্ত ২৭০০ জন পর্বতারোহী সর্বমোট ৪১০২ বার এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেছে। এই পর্বতারোহীরাই হল নেপালের পর্যটন আয়ের প্রধান উৎস, এর কারণ এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ জয় করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক পর্বত আরোহীকে ২৫০০০ মার্কিন ডলার মূল্যের একটি ব্যয়বহুল পারমিট জোগাড় করতে হয়। এই পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করতে গিয়ে এই পর্যন্ত ২১০ জন পর্বতারোহী প্রাণ হারিয়েছে। এর মধ্যে ৮ জন পর্বতের অত্যন্ত উঁচুতে উঠে ঝড়ের কবলে পড়ে প্রাণ হারান। বিশেষত 'ডেথ জোন' বলে এক জায়গা আছে যেখানে আবহাওয়া এতটাই প্রতিকূল যে সেখানে একবার ঝড়ের কবলে পড়লে পর্বত আরোহীদের মৃতদেহও উদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

কে২

কে২ হল মাউন্ট এভারেস্টের পর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৮,৬১১ মিটার, ফুটের হিসাবে ২৮,২৫১ ফুট। হিমালয় পর্বতমালার কারাকোরাম পর্বত রেঞ্জের অন্তর্গত এই পর্বতশৃঙ্গটি পাকিস্তানের গিলগিট বালতিস্তান ও চিনের জিংজিয়ানের তাকস্কোরগান সীমান্তে অবস্থিত। এই পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করা অত্যন্ত দূর্গম হওয়ায় এটি জংলি পর্বত নামেও পরিচিত। অন্নপূর্ণা পর্বতশৃঙ্গের পর আট হাজারি পর্বতশৃঙ্গগুলোতে আরোহণ প্রচেষ্টায় মৃত্যুর হারের দিক থেকে কে২-র অবস্থান দ্বিতীয়। কারণ এর চূড়ায় আরোহণকারী প্রতি চারজনের মধ্যে একজন মৃত্যুবরণ করেছে। এই পর্বতশৃঙ্গে আরোহণের প্রথম চেষ্টা করেন একদল অ্যাংলো সুইস অভিযাত্রীর দল ১৯০২ সালে। তারা শৃঙ্গের উত্তর-পূর্ব ধার বরাবর ১৮৬০০ ফুট অর্থাৎ মিটারে ৫৬৭০ মিটার পর্যন্ত উঠতে সমর্থ হন। এরপরে আরও অনেকে এই শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করে কিন্তু অসফল হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯০৯ সালে লুইগি আমেদিও ডিউক অব আবুরাজজির নেতৃত্বে শৃঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব ধার বরাবর সেটি কিনা পরে আবুরাজজি রিজ নামে পরিচিত হয় একটি ইতালীয়দের অভিযান। এবং সবথেকে বড় ব্যাপার হল, তারা প্রায় ২০০০০ ফুট অর্থাৎ মিটারে ৬১০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত উঠতে সমর্থ হয়। এরপর ১৯৩৮ সালে একদল আমেরিকান অভিযাত্রীর দল চার্লস হাউসটনের নেতৃত্বে আবুরাজ্জি রিজ ধরে প্রায় ২৬০০০ ফুট পর্যন্ত উঠতে সমর্থ হয়। ১৯৫৪ সালে একটি ইতালীয় দল ভূতাত্ত্বিক আরদিতো দেসিওর নেতৃত্বে আবুরাজ্জি রিজ বরাবর কে-২ জয় করেন। আকিলে কমপাগননি এবং লিনো লাসেদেলি ১৯৫৪ সালের ৩১ জুলাই স্থানীয় সময় অনুসারে বিকেল ৬টার সময় সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছন। তবে এখনও পর্যন্ত শীতকালে কে২-র চূড়ায় আরোহণ করা সম্ভব হয়নি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা

কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমালয় পর্বতমালার একটি পর্বতশৃঙ্গ। মাউন্ট এভারেস্ট ও কে২-এর পরে এটি পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ। এই পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ৮,৫৮৬ মিটার অর্থাৎ ফুটের হিসাবে ২৮,১৬৯ ফুট। এটি ভারতের সিকিম রাজ্যের সঙ্গে নেপালের পুর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে অবস্থিত। কাঞ্চনজঙ্ঘা শব্দটি শুনলে মনে হয় এর অর্থ কাঞ্চন+জঙ্ঘা, কিন্তু আসলে তা নয়। এই নামটি এসেছে সম্ভবত কান, চেং, জেং, গা থেকে। এর অর্থ তেনজিং নোরগে তার বইতে বিশ্লেষণ করেছেন। তেনজিং নোরগে তার লিখিত বই 'ম্যান অব এভারেস্ট'-এ কাঞ্চনজঙ্ঘার মানে লিখেছেন তুষারের পাঁচ ধনদৌলত। এটির পাঁচটি চূড়া আছে। এর মধ্যে চারটির উচ্চতা ৮,৪৫০ মিটারের উপরে। এখানে ধনদৌলত বলতে ঈশ্বরের পাঁচ ভাণ্ডারকে বোঝানো হয়েছে, যা হল সোনা, রুপো, রত্ন, শস্য ও পাঠ্যপুস্তক।

আকোনকাগুয়া

আকোনকাগুয়া হল এশিয়ার বাইরে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এটি পশ্চিম আর্জেন্টিনাতে, আর্জেন্টিনা চিলি সীমান্তে অবস্থিত। এটি আন্দেজ পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এটি একটি মৃত আগ্নেয়গিরিও বটে। এই পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ৬,৯৬২ মিটার। ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের পর্বতারোহী মাটিয়াস যুরব্রিজ্ঞেন প্রথম এর শীর্ষে আরোহণ করেন। এটি দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ।

দেনালি

দেনালি উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এই দেনালি পর্বত আরেকটি নামেও পরিচিত সেটি হল ম্যাকিনলি পর্বত। ইংরেজি ভাষায় যাকে বলা হয় Mount Mckinley। এটি দক্ষিণ মধ্য আলাস্কার আলাস্কা পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই আলাস্কা পর্বতমালায় দেনালি জাতীয় পার্ক ও সংরক্ষণস্থলের মধ্যে আই পর্বত অবস্থিত। সমুদ্রতল থেকে এই পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ৬,১৯৪ মিটার। স্থানীয় আদিবাসী ও আমেরিকানরা এই পর্বতশৃঙ্গকে দেনালি অর্থাৎ 'সবচেয়ে উঁচু' বলে ডাকে সেই থেকে এই শৃঙ্গের এই নামকরণ। ১৮৯৬ সালে পর্বতটিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম ম্যাকিনলির নামে নামকরণ করা হয়। ১৯১৩ সালে ইংরেজ মার্কিন ধর্মযাজক ও পর্যটক হাডসন স্টাক তিনজন সহযাত্রী-সহ সবার প্রথম এই পর্বতের শৃঙ্গ জয় করেন। তারপরে বহু মানুষ এই শৃঙ্গ জয় করেছেন এবং আজও করে যাচ্ছেন।

এলব্রুশ পর্বত

এলব্রুশ পর্বত রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের দক্ষিণাংশে, জর্জিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সীমান্তের ঠিক উত্তরে অবস্থিত একটি পর্বত। এটি ককেশাস পর্বতমালার তো বটেই এমনকী গোটা ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই পর্বতটির জন্মের পেছনে একটা কারণ আছে, আজ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে এক বিশাল আগ্নেয় বিস্ফোরণের ফলে এই পর্বতশৃঙ্গের জন্ম হয়। সেই আগ্নেয়গিরিটি বর্তমানে বিলুপ্ত, কিন্তু বৃহত্তর ককেশাস অঞ্চলের ভৌগোলিক অস্থিতিশীলতার কারণে এই অঞ্চলে কিছুদিন পর পরই বড়সড় ভূমিকম্প হতেই থাকে। এলব্রুশ পর্বতের দু'টি জ্বালা মুখ আছে। একটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,৬৪২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। অপরটির উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৫,৫৯৫ মিটার। পর্বতের উপরে বেশকিছু বিশালাকার হিমবাহ আছে যেগুলি গলে কুবান ও অন্যান্য নদী সৃষ্টি হয়েছে। পর্যটক ও পর্বতারোহীদের জন্য পর্বতটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ককেশাস পর্বতের।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৩ মে ২০১৭

স্পেশাল টিউশন: ইংলিশ গ্রামার

Gender

Gender-এর আভিধানিক অর্থ হল লিঙ্গ। অর্থাৎ Gender হচ্ছে কোনও noun বা pronoun-এর সেই রূপ যা দিয়ে প্রকাশ করা হয় ওই noun বা pronounটি স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব না কি উভয় লিঙ্গ।

Gender সাধারণত চার প্রকার। যথা— Masculine Gender (পুং লিঙ্গ), Feminine Gender (স্ত্রী লিঙ্গ), Neuter Gender (ক্লীব লিঙ্গও), Common Gender (উভয় লিঙ্গ)

Masculine Gender: যে noun বা pronoun দ্বারা কোনও প্রাণীর পুরুষবাচক অবস্থাকে বোঝায় তাকে Masculine Gender বলে। যেমন— Man, Boy, Brother, Bull, He, Dog, Cock ইত্যাদি।

Feminine Gender: যে noun বা pronoun দ্বারা কোনও প্রাণীর স্ত্রীবাচক অবস্থাকে বোঝায় তাকে Feminine Gender বলে। যেমন— Woman, Cow, Sister, Girl, She, Bitch, Hen ইত্যাদি।

Neuter Gender: যে noun দ্বারা কোনও প্রাণীর স্ত্রী বা পুরুষ কোনও অবস্থাকে বোঝায় না তাকে Neuter Gender বলে। যেমন— Book, Pen, Table ইত্যাদি।

Common Gender: যে noun বা pronoun দ্বারা কোনও প্রাণীর পুরুষ বা স্ত্রী যে কোনও অবস্থাকে বোঝায় তাকে Masculine Gender বলে। যেমন— Baby, Cousin, Student, Teacher, Citizen, Enemy ইত্যাদি।

Gender পরিবর্তন এর নিয়ম: কতগুলো noun-এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে Feminine Gender করতে হয়। যেমন— Father - Mother, Brother - Sister, Husband - Wife, King - Queen, Fox - Vixen, Dog - Bitch, Male - Female, Uncle - Aunt, Wizard - Witch, Bull - Cow, Lord - Lady, Sir - Madam, Tailor - Seamstress, Papa - Mamma

কতগুলো noun-এর শেষে ess যুক্ত করে Feminine Gender করতে হয়। যেমন— Author - Authoress, Baron - Baroness, Count - Countess, Heir - Heiress, Peer - Peeress, Prophet - Prophetess, Steward - Stewardess, Manager - Manageress, God - Goddess, Priest - Priestess, Host - Hostess, Jew - Jewess, Lion - Lioness, Poet - Poetess

কতগুলো Masculine noun-এর শেষের vowel তুলে দেওয়ার পর শেষে ess যোগ করে Feminine করতে হয়। যেমন— Actor - Actress, Conductor - Conductress, Hunter - Huntress, Instructor - Instructress, Songster - Songstress, Traitor - Traitors, Benefactor - Benefactress, Tiger - Tigress, Director - Directress

কিছু কিছু Masculine noun-এর ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রমীভাবে ess যুক্ত হয়। যেমন— Abbot - Abbess, Emperor - Empress, Master - Miss, Murderer - Murderess, Duke - Duchess, Master - Mistress, Mr - Mrs

কিছু Masculine noun-এর শেষে a, ine, ix যুক্ত করে Feminine করতে হয়। যেমন— Don - Dona, Signor - Signora, Executor - Executrix, Hero - Heroine, Sultan - Sultana, Prosecutor - Prosecutrix, Proprietor - Proprietrix

Compound noun-গুলোর পুরুষবাচক অংশটিকে Feminine করে।

প্রথম nounটিকে Feminine করে— Boy-baby - Girl-baby, Bull-calf - Cow-calf, Billy-goat - Nanny-goat, Man-servant - Maid-servant, Male-child - Female-child, Son-in-law- Daughter-in-law, Brother-in-law - Sister-in-law, Male-servant - Female-servant, Mankind - Womankind

পরের nounটিকে Feminine করে— Fisherman - Fisherwoman, Gentleman - Gentlewoman, Peacock - Peahen, Stepbrother - Stepsister, Grandfather - Grandmother, Godfather - Godmother, Landlord - Landlady, Stepson - Stepdaughter, Great-uncle - Great-aunt

প্রকৃতিতে বিরাজমান বিভিন্ন প্রাণহীন সত্তাকে প্রাণবন্ত সত্তারূপে গণ্য করলে তাদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের Gender গণ্য করা হয়।

শক্তিশালী সত্তাগুলোকে পুরুষবাচক বা Masculine হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন- sun, summer, winter, death, time, anger, war, thunder, fear, ইত্যাদি।

সৌন্দর্য, কোমলতা, স্নিগ্ধতার ন্যায় নারীসুলভ গুণের অধিকারী সত্তাগুলোকে Feminine হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন—Moon, peace, hope, nature, earth, night, spring ইত্যাদি।

দেশ, রেলগাড়ি, জাহাজ সর্বদা Feminine হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন— 1. The ship reflects her beauty. 2. Our country lost her famous persons.

কিছু noun সর্বদা Feminine রূপে ব্যবহার হয়। এদের কোনও Masculine নেই। যেমন— nurse, virgin, prude, serin, shrew ইত্যাদি।

আবার কতগুলো noun সর্বদা Masculine হিসেবে গণ্য করা হয়। এদের কোনও Feminine নেই। যেমন— judge, chairman, knight, person, captain.

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ *(প্রথম পাতার পর)*

রাখবে নিজের লক্ষ্যে অটল থাকতে হলে মন দৃঢ় করতে হবে। এখানেও অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়। এছাড়া, বড়দের উপদেশ ও তোমার আদর্শকে সামনে রেখে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে, আত্মবিশ্বাস সফল হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দরকার। কেননা, নিজের ভেতর বিশ্বাস না থাকলে কিছুই করা সম্ভব নয়। নিজেকে, নিজের প্রতিভাকে বিশ্বাস করো। কখনও হীনম্মন্যতায় ভুগবে না। কোনও ছাত্রই কোনও অংশে কম নয়। সবার ভেতরই কিছু না কিছু গুণ দিয়ে পাঠিয়েছেন ঈশ্বর। সেই গুণটাকে চেনাই আসল বিষয়। হয়তো তোমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান। কিন্তু বাড়ির সবাই চান তুমি ইংরেজি নিয়ে পড়ো। সেক্ষেত্রে তোমার মনের কথা খোলাখুলি বাবা-মায়ের কাছে খুলে বলো। অনিচ্ছা সহকারে কোনও কাজ করলে সেটা কোনওদিন সফল হয় না। জরুরি নয় তোমাকে পড়ালেখা নিয়েই সবসময় ভাবতে হবে বা কেরিয়ার গড়তে হবে। খেলাধুলো বা গান নিয়েও কেরিয়ার গড়তে পারো, যদি তোমার ইন্টারেস্ট সেদিকে থাকে। তাই বলে পড়াশোনা না করলে কিন্তু হবে না। তুমি যা নিয়েই কেরিয়ার গড়ে না কেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা তোমার থাকতেই হবে। স্কুল লেভেলে এই জন্যই পড়াশোনা নিয়ে সিরিয়াস হওয়া উচিত। তবে যাই করো না কেন, পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য মেলে না। কথায় আছে, 'কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে'। অর্থাৎ, মন পরিষ্কার রেখে পরিশ্রম করলে এর সুফল তুমি পাবেই। আর একটা কথা মাথায় রাখবে, ঈশ্বরও তাদের সাহায্য করেন যে নিজের সাহায্য করে। তাই ভালো করে পড়াশোনা করো এবং সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। মনে রাখবে, শুধু ভালো রোজগার করলেই হবে না। একজন ভালো মানুষ হতে হবে তোমাকে। কেননা, তোমার ব্যবহারই তোমার পরিচয়। ভালো মানুষ হতে না পারলে যতই টাকা থাকুক না কেন, তা কাজে আসে না। সবসময় একটা কথা মনে রাখবে, তুমি উত্তম বলেই অন্যেরা অধম নয়। আর সবার প্রতি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি রাখবে এবং গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে। তাদের আশীর্বাদও তোমার সফল হওয়ার নেপথ্যে কাজ করে।

মন জিততে হাতের লেখা *(প্রথম পাতার পর)*

রাখতে রুমাল বা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

হাতের লেখা সুন্দর দেখতে লাগার আরও কিছু মাপকাঠি আছে, যেমন মার্জিন, সোজা লাইন, শব্দ ও লাইনের মাঝে মানানসই ও একরকমের ফাঁক। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এমন দুটো বিষয় যাদের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে হাতের লেখার কোনও যোগ নেই। এরা হল ভাষা আর বানান। খেয়াল করে দেখবে একই ছাপার অক্ষরে লেখা জীবন্ত ও সুন্দর মনে হয় যখন তার ভাবনা বা বিষয় মন ছুঁয়ে যায়।

হাতের লেখা অনেকটাই ছবি আঁকার মতো। রেখা, টান, বাঁক হাতের লেখাকে সুন্দর করে তোলে। তাই অনেকেই বলে যাঁরা ভালো আঁকে তারা নাকি ভালো লেখে। কথাটা অনেক সময়েই সত্যি। তাই সুন্দর হাতের লেখার জন্যে আঁকা শেখার সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে।

সবশেষে বলা যায় ভালো হাতের লেখার জন্যে চাই ইচ্ছে, অভ্যেস ও ভালোলাগা। লিখতে ভালো না লাগলে আর হাতের লেখা ভালো কী করে হবে!

স্পেশাল টিউশন: বাংলা ব্যাকরণ

ক্রিয়াপদ

তারা মাঠে খেলছে। আমরা ভাত খাচ্ছি।

'খেলছে' ও 'খাচ্ছি' পদ দুটো দ্বারা আমরা কোনও কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে বোঝাচ্ছি। তাই এই পদ দু'টি হল ক্রিয়াপদ।

যে পদের দ্বারা কোনও কার্য সম্পাদন করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বারা কোনও পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কালে কোনও কার্যের হওয়া বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন—

১. ভাবপ্রকাশ ক্রিয়া: ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদ ২ প্রকার। যেমন— সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া

২. বিবিধ: অন্যান্যভাবে ক্রিয়াপদ ৬ প্রকার। যেমন— অকর্মক ক্রিয়া, সকর্মক ক্রিয়া, দ্বিকর্মক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, মিশ্র ক্রিয়া।

ক্রিয়াপদের গঠন কীভাবে হয়: ধাতুর সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করতে হয়। যেমন: পড়ছে'-পড় ধাতু'+ছে' বিভক্তি।

ক্রিয়া পদের বিভিন্ন ভাগের উদাহরণ—

১. সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া বাক্যকে সমাপ্ত করে তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

২. অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া বাক্যকে সমাপ্ত করতে পারে না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

৩. সকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্মপদ থাকে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।

৪. অকর্মক ক্রিয়া: যে বাক্যে কোনও কর্মপদ থাকে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।

৫. দ্বিকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

৬. সমধাতুজ ক্রিয়া: যে বাক্যে ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে তৈরি তাকে সমধাতুজ ক্রিয়া বলে।

৭. প্রযোজক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।

৮. নামধাতু: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধন্যাত্মক অব্যয়ের পরে আ-প্রত্যয়যোগে গঠিত ধাতুকে নামধাতু বলে।

৯. যৌগিক ক্রিয়া: সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে গঠিত বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশক ক্রিয়াকে যৌগিক ক্রিয়া বলে।

ক্রিয়াপদ বাক্যগঠনের অপরিহার্য অঙ্গ। ক্রিয়াপদ ভিন্ন কোনও মনোভাবই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না।

সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের (মনোভাবের) পরিসমাপ্তি জ্ঞাপিত হয় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: ছেলেরা খেলা করছে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।

অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: সকালে পড়তে পড়তে...। আমরা হাত-মুখ ধুয়ে...। আমরা বিকেলে খেলতে...। এখানে, 'পড়তে পড়তে' 'ধুয়ে' ও 'খেলতে' ক্রিয়াপদগুলোর দ্বারা কথা শেষ হয়নি। কথা সম্পূর্ণ হতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই এই শব্দগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া। বাক্যগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করতে হলে সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ইয়া (পড়িয়া), ইলে (পড়িলে), ইতে (পড়িতে), এ (পড়ে), লে (পড়লে), তে (পড়তে) বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ অসমাপিকা ক্রিয়া।

জুন মাস থেকে 'ছুটির ফাঁদে' সাপ্লিতে শুরু হচ্ছে পুজো স্পেশাল ট্রাভেল গাইড

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৩ মে ২০১৭

তোমাদের প্রিয় ‘উত্তরণ’-এ **‘আমার স্কুল’** বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি। খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো ‘CONTENT FOR AAMI O AAMAR SCHOOL’

মেল আইডি:
jugasankha.suppli@gmail.com

মেল করার ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে নীচের নম্বরে ফোন করতে পারো: **শর্মিলাদি** (কলকাতা ও শিলিগুড়ি সংস্করণ) 9231914537 এবং **বিদিশাদি** (শিলচর, গুয়াহাটি ও ডিব্রুগড় সংস্করণ) 8486581362

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন: ভূগোল

নদী ও নদীর কাজ

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় ‘নদী’। প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক নদী কীভাবে সৃষ্টি হয়। পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা ছোট ছোট জলধারাগুলো যখন পরস্পর মিলিত হয়ে ভূমির ঢাল অনুসারে উঁচু থেকে নিচু স্থানের দিকে বয়ে চলে, তখনই নদীর সৃষ্টি হয়।

মনে রাখবে, নদী যেখানে সৃষ্টি হয় সেই স্থানকেই নদীর উৎস বলা হয়। সাধারণত পাহাড়-পর্বত বা মালভূমির মতো কোনও উঁচু জায়গায় নদী সৃষ্টি হয়। ভারতের প্রধান নদী গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ‘গোমুখ’ থেকে। এবার বলি ‘মোহনা’ কাকে বলে। নদী যেখানে গিয়ে শেষ অর্থাৎ নদী কোনও না কোনও সাগর-উপসাগর, হ্রদ, জলাশয় বা অন্য কোনও নদীতে গিয়ে মেশে, সেই জায়গাকেই নদীর মোহনা বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা নদীর মোহনা।

মাথায় রাখবে, নদী হলো স্বাভাবিক প্রবাহমান জলধারা, যা অভিকর্ষের টানে, ভূমির ঢাল অনুসারে উৎস থেকে মোহনার দিকে বয়ে চলে। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান নদী হল আমাজন, মিসৌরি, মিসিসিপি, নীল, ভলগা, ইয়াংসিকিয়াং, মারে ডার্লিং।

এবার বলি, ধারণ অববাহিকা এবং জলবিভাজিকা বলতে কী বোঝায়?

ধারণ অববাহিকা: উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলের বরফ গলা জল বা বৃষ্টির জল অসংখ্য ছোট ছোট জলধারার মাধ্যমে বয়ে গিয়ে পর্বতের পাদদেশে এসে নদী তৈরি করে। পর্বতের উপর থেকে পাদদেশ পর্যন্ত যে বিরাট অংশের জল মূল নদীতে এসে পড়ে, সেই অঞ্চলটাকেই ওই নদীর ধারণ অববাহিকা বলা হয়।

জলবিভাজিকা: উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে যখন বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির জল ভূমির ঢাল বরাবর বিভিন্ন দিকে ভাগ করে বা ‘বিভাজন’ করে বলে একে জলবিভাজিকা বলে। জলবিভাজিকার বিভিন্ন দিকে বয়ে যাওয়া জল, একাধিক ছোট ছোট জলধারার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে মিলিত হয়ে, মূল নদীর সৃষ্টি করে।

এবারে উপনদী, শাখানদী, নদীর উপত্যকা, নদী অববাহিকা, দোয়াব, অন্তর্বাহিনী নদী, আন্তর্জাতিক নদী, নিত্যবহ নদী, অনিত্যবহ নদী নিয়ে আলোচনা করা যাক।

উপনদী: উৎস থেকে সৃষ্টি হয়ে কোনও নদী যখন অন্য কোনও নদীতে এসে মেশে, তখন তাকে ওই নদীটির উপনদী বলে। যেমন— গঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, কোশী, গণ্ডক নদীগুলো গঙ্গার উপনদী।

শাখানদী: মূল নদী থেকে যে সব নদী শাখার মতো বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথা মেশে তাদেরকে শখানদী বলা হয়। ভাগীরথী-হুগলি হল গঙ্গার প্রধান শাখানদী।

নদীর উপত্যকা: ‘উৎস’ থেকে ‘মোহনা’ পর্যন্ত যে খাতের মধ্যে দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় তাকে নদীর উপত্যকা বলে।

নদী অববাহিকা: নদী তার উপনদী ও শাখানদী সহ উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত যে অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই বিস্তীর্ণ ভূমিভাগকে নদী অববাহিকা বলে। আমাজন নদীর অববাহিকা হল পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা।

দোয়াব: পাশাপাশি প্রবাহিত দুটো নদীর মধ্যবর্তী স্থানকেই ‘দোয়াব’ বলে। ভারতের গঙ্গা ও যমুনা নদীর ‘দোয়াব’ অংশে আগ্রা, এলাহাবাদ শহর অবস্থিত।

অন্তর্বাহিনী নদী: যে নদী কোনও দেশের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে সেই দেশের মধ্যেই কোনও হ্রদ বা জলাশয়ে গিয়ে মেশে তাকে অন্তর্বাহিনী নদী বলা হয়। ভারতের লুনি, রাশিয়ার আমুদরিয়া হলো অন্তর্বাহিনী নদী।

আন্তর্জাতিক নদী: একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়া নদীগুলিকেই আন্তর্জাতিক নদী বলে। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, দানিয়ুব, ইউরোপের রাইন হল আন্তর্জাতিক নদী।

নিত্যবহ নদী: সাধারণত যে সব নদী উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে সৃষ্টি হয়, বেশির ভাগ সময়ই সেই জলের উৎস হয় বরফ গলা জল। এই নদীগুলোতে সারা বছরই জল থাকে। সেই জন্য এই নদীগুলোকে নিত্যবহ নদী বলা হয়ে থাকে।

অনিত্যবহ নদী: মালভূমি বা অন্য কোনও কম উঁচু জায়গায় সৃষ্টি হওয়া নদীগুলোর জলের উৎস সাধারণত বৃষ্টির জল। তাই শুধুমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া, বছরের অন্য সময় এই নদীগুলোতে জল প্রায় থাকে না। তাই এদেরকে অনিত্যবহ নদী বলা হয়।

নদীর কাজ: নদীর প্রধানত তিনটি কাজ। ক্ষয়কাজ, বহনকাজ ও সঞ্চয়কাজ।

ক) ক্ষয়কাজ: নদী মূলত বয়ে যাওয়া জলধারা। নদী তার জলস্রোতের ধাক্কায় মাটি, বালি, ছোট-বড় নুড়ি অথবা বড় বড় পাথর সবই চূর্ণ করে এগিয়ে চলে। নদীর এই কাজকেই নদীর ক্ষয়কাজ বলা হয়।

খ) বহনকাজ: নুড়ি, কাঁকর, বালি, পলি সবই নদী স্রোতের সঙ্গে উঁচু থেকে নিচু অঞ্চলের দিকে বয়ে নিয়ে যায়, এটাই হল নদীর বহনকাজ।

গ) সঞ্চয়কাজ: বয়ে চলতে চলতে কোথাও নদীর স্রোত কমে গেলে নুড়ি, কাঁকর, বালি, পলি নদীর পাশে বা নদীর মধ্যে জমা হতে থাকে। এই কাজকেই নদীর সঞ্চয়কাজ বলে।

মনে রাখবে, নদীর এই তিনপ্রকার কাজ কিন্তু নির্ভর করে নদীর শক্তির উপর। নদীতে জলের পরিমাণ, গতিবেগ, ভূমির ঢাল প্রভৃতি থেকে নদী শক্তি পায়। নদীর শক্তি বেড়ে গেলে নদীর ক্ষয় আর বহন কাজ বেশি হয়। অন্যদিকে নদীর শক্তি কমে গেলে নদী তখন সঞ্চয় করে।

ক্লাস এইট-এর টিউশন: বিজ্ঞান

বাষ্পীভবন

তোমরা নিশ্চয় লক্ষ করেছ জল দিয়ে হাত ধোয়ার পর সেই হাত না মুছে ধরে রাখলে হাত শুকিয়ে যায়। তোমাদের কখনও মনে হয়েছে কি, জল কোথায় গেল? আবার অনেক সময় দেখবে একটা পাত্রে জল নিয়ে তা উনুনে বসিয়ে কিছুক্ষণ ফোটালে জল ফুটতে ফুটতে একটা সময় জল শেষ হয়ে যায় এবং পাত্রটি খালি হয়ে যায়। এই জলই-বা কোথায় যায়? জল আসলে বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে যায়। আর সেই কারণেই ভিজে জামাকাপড় শুকিয়ে যায়, জল দিয়ে ঘর মুছলে শুকিয়ে যায়, আবার গ্রীষ্মকালে নদী-নালা, পুকুরের জলও শুকিয়ে যায়।

জলকে বাষ্পে পরিণত হতে গেলে তাপ গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে হাতে লাগা তরলের বাষ্পে পরিণত হওয়ার জন্য বাইরে থেকে আলাদা করে আমাদের তাপ প্রয়োগ করতে হয় না। চারপাশ থেকে অথবা শরীরে থেকেই দরকারি তাপ সংগ্রহ করে নেয়। এই কারণেই জল বাষ্পীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াটি খুব ধীর গতিতে হয়।

মনে রাখবে, এইভাবে শুধুমাত্র জলই বাষ্পীভূত হয়, তা কিন্তু নয়। স্পিরিট বা ওই জাতীয় কোনও উদ্বায়ী তরল অবশ্য এই পদ্ধতিতে তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়ে যায়। যে কোনও উষ্ণতায় এইভাবে কোনও তরল তার উপরিতল থেকে ধীরে ধীরে বাষ্পে রূপান্তরিত হওয়ার এই পদ্ধতিকেই বলা হয় বাষ্পায়ন।

ঘরোয়া পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়টা বুঝে নিতে পারো: দু’টি একই মাপের কাপড় নিয়ে একই রকম ভাবে জলে ডোবাও। এরপর দু’টি কাপড়ের টুকরোকে নিংড়ে নাও। এবার একটি কাপড়ের টুকরোকে কয়েকটি ভাঁজ করে শুকোতে দাও। অন্য কাপড়ের টুকরোটি কোনও রকম ভাঁজ না করে সম্পূর্ণ খোলা অবস্থায় শুকোতে দাও। দেখবে, শুকোতে দেওয়া কাপড়ের টুকরোটি তাড়াতাড়ি শুকোবে।

মনে রাখবে, জল তার উপরিতল থেকে বাষ্পে পরিণত হয়। তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল যত বাড়ে তরল তত তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়। বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে।

কিন্তু শীতকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকে। শীতকালে ভিজে জামাকাপড় থেকে জল তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়ে যায় বলে ভিজে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এছাড়া বাষ্পায়নের হার তরলের উপরের চাপ, বায়ু চলাচল ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

একনজরে বাষ্পায়ন— ক) যদি তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেশি হয় তাহলে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়। খ) বাষ্পায়ন হওয়ার জন্য কোনও বিশেষ উষ্ণতা অর্জনের প্রয়োজন হয় না। তরলের উষ্ণতা বেশি হলেও বাষ্পায়ন তাড়াতাড়ি হয়। গ) তরলের উপর বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলেও বাষ্পায়ন দ্রুত হয়। ঘ) তরলের প্রকৃতির উপর বাষ্পায়নের হার নির্ভর করে। যেমন স্পিরিট খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়।

আচ্ছা বলো দেখি, গরমকালে ঘামে ভেজা শরীরে হাওয়ার সামনে দাঁড়ালে আরাম হয় কেন?

দেখবে সেই সময় শরীরের ঘাম শুকিয়ে যায় কারণ ঘাম বাষ্পীভূত হয়ে যায়। ঘাম বাষ্প হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লীনতাপ দেহ থেকে শোষিত হলে দেহে শীতলতার অনুভূতি হয়। তাই সেই সময় আরাম লাগে। সেই কারণেই হাতে স্পিরিট বা ইথার ঢাললে খুব ঠান্ডা লাগে।

এবার একটু স্ফুটন নিয়ে আলোচনা করা যাক। আগেই বলেছি একটি পাত্রে জল নিয়ে উনুনের উপর রাখলে জল ফুটতে শুরু করে এবং দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। দেখবে জল যখন টগবগ করে ফোটে তখন সমগ্র জলের মধ্যেই একটা উথাল-পাথাল অবস্থা দেখা যায়। কিন্তু, থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখবে, ওই সময় জলের উষ্ণতার কোনও পরিবর্তন হয় না।

এই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলের সমগ্র অংশ থেকে অতি দ্রুত বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়াটিকেই স্ফুটন বলা হয়। আবার যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলের স্ফুটন শুরু হয় ও যতক্ষণ স্ফুটন চলে ততক্ষণ ওই উষ্ণতায় স্থির থাকে, সেই উষ্ণতাকে ওই তরলের স্ফুটনাঙ্ক বলা হয়।

এবার দেখা নেওয়া যাক তরলের স্ফুটনাঙ্ক কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

ক) তরলের প্রকৃতি।

খ) তরলে দ্রবীভূত পদার্থের উপস্থিতি। তরলে যদি কোনও পদার্থ দ্রবীভূত করা হয়, সাধারণত তরলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। যেমন প্রায় ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জলের স্ফুটন হয়। কিন্তু জলে নুন মেশালে ১০৯ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ওই নুনজলের স্ফুটন হয়।

গ) স্ফুটনের সময় তরল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। তরল বাষ্পে রূপান্তরিত হলে তার আয়তন বেড়ে যায়।

মনে রাখবে, চাপ বাড়লে স্ফুটন প্রক্রিয়া বাধা পায় বলে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। ফলে কোনও পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক ঠিক করার সময় তা একটি নির্দিষ্ট চাপে ঠিক করা হয়ে থাকে। যেমন প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি।

আবার উষ্ণতা স্থির রেখে কোনও তরলের একক ভরের বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য যে তাপের প্রয়োজন হয় সেই তাপকে ওই তরলের স্ফুটনের লীনতাপ বলা হয়।

স্টিমের লীনতাপ ৫৩৭ ক্যালোরি/গ্রাম বলতে বোঝায় প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এক গ্রাম জলকে একই উষ্ণতায় এক গ্রাম স্টিমে রূপান্তরিত করতে ৫৩৭ ক্যালোরি তাপ প্রয়োগ করতে হয়।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৩ মে ২০১৭

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ভূগোল

আবহবিকার

আজ আমরা আবহবিকার বা ভূমিরূপ পরিবর্তনের প্রথম ধাপ সম্পর্কে জানব। পৃথিবীপৃষ্ঠের যে রূপ তা সমানে পরিবর্তিত হয়। প্রথমে শিলাস্তর যা পৃথিবীর উপরিতলের কাঠামো তা নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ভাঙতে থাকে। শিলাস্তরের এই বিচূর্ণীভবন বা শিলাস্তর ফাটার বা টুকরো হওয়ার প্রক্রিয়াকেই আবহবিকার বলে। বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুচাপ, তুষারপাত, বৃষ্টিপাত, মরুঝড় ইত্যাদি সমানে শিলাস্তরের উপরিভাগে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটিয়ে শিলাস্তরের ক্ষয় করে বা শিলাস্তর আলগা করে দেয়। এই পরিবর্তন আবহাওয়াজনিত হওয়ায় একেই আবহবিকার বলে। আবহবিকারে শিলা টুকরো হয়ে বা ফাটল ধরে ওই স্থানেই জমা হতে থাকে তাই এই প্রক্রিয়াকে বিচূর্ণীভবনও বলে।

আবহবিকার তিন প্রকারের— যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈব।

শিলা ভাঙার প্রক্রিয়া যখন শিলার রাসায়নিক কোনও পরিবর্তন না ঘটিয়ে শিলা চূর্ণবিচূর্ণ করে তখন তাকে যান্ত্রিক আবহবিকার বলে। সাধারণত উষ্ণতা, বায়ুর প্রবাহ বা চাপ, তুষারপাত ও বৃষ্টিপাত এই ধরনের আবহবিকার ঘটায়। যেসব স্থানে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার পরিবর্তন খুব বেশি পরিমাণে ঘটে যেমন, মরু অঞ্চল ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে সেখানে শিলার ক্রমাগত সংকোচন ও প্রসারণে শিলা আলগা হয়ে পড়ে বা ফাটল ধরে। তাপমাত্রার কারণে হওয়া আবহবিকার নানাভাবে শিলার পরিবর্তন ঘটায় বলে এরও কিছু প্রকারভেদ আছে। যখন শুষ্ক ও কঠিন শিলায় ঢাকা এলাকায় তাপের পরিবর্তনের কারণে মূল শিলাস্তরে ফাটল ধরে ও ফাটল বরাবর বিচ্ছিন্ন হয়ে মূল শিলা প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয় তখন তাকে খণ্ডীকরণ বলে। পেঁয়াজের খোলা যেভাবে আলগা করা যায়, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিলার উপরিস্তর যদি ওইভাবে উন্মোচিত হতে থাকে তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে শল্কমোচন বলে। গ্রানাইট শিলায় এই ধরনের পরিবর্তন বেশি দেখা যায়। দিনের বেলায় শিলার উপরিস্তর ভিতরের স্তরের থেকে বেশি গরম হয়। ফলে তা বেশি প্রসারিতও হয়। এর ফলে দুই স্তরের মধ্যে যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় তার ফলে উপরের স্তর আলগা হয়ে খুলে আসে। তুষার বা শিলার ফাটলে জল জমে বরফ হয়ে শিলায় এক ভিন্ন প্রকৃতির পরিবর্তন আনে। জল জমে বরফ হলে তা শিলায় চাপের সৃষ্টি করে ও ফাটল ধরায়। আবার অনেকক্ষেত্রে শিলা যেসব নানা প্রকারের খনিজ উপাদানে গঠিত তাদের মধ্যে তাপ প্রবেশ করে নানা রকমের বিক্রিয়া করে ফাটল ধরায়। এই পদ্ধতিকে ক্ষুদ্রকণা বিশরণ বলে।

রাসায়নিক আবহবিকারের নাম থেকেই বোঝা যায় যে এইক্ষেত্রে শিলা ভাঙার প্রক্রিয়াটি শিলার মূল উপাদানগত গঠনের রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে হয়। বিক্রিয়ার ভেদ অনুসারে এই প্রক্রিয়ার কয়েকটি প্রকারভেদ হয়। জারণ প্রক্রিয়ায় শিলায় উপস্থিত লোহা অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে শিলাকে লাল বা হলুদে পরিবর্তন করে ও ভাঙন ধরায়। অন্যদিকে বাতাসে উপস্থিত কার্বন ডাই অক্সাইড বৃষ্টির জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে। এই অ্যাসিড চুনাপাথরে ঢাকা এলাকায় সহজেই শিলায় ফাটল ধরায়। এই প্রক্রিয়াকে অঙ্গারযোজন বলে। শিলার উপাদানের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় শিলার রাসায়নিক গঠনে পরিবর্তন হয়ে শিলা যখন প্রসারিত হয় ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে তখন তাকে জলযোজন বলে। আরেক প্রকারের রাসায়নিক আবহবিকার হল আর্দ্রবিশ্লেষণ। সাধারণত নিরক্ষীয় বা ক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ুর আর্দ্রতা শিলায় বিয়োজন ঘটিয়ে আবহবিকার ঘটায়।

শেষ প্রক্রিয়াটি হল জৈববিকার। গাছের শিকড় দ্বারা সৃষ্ট চাপ বা ইঁদুর, কেঁচো, ছুঁচো ইত্যাদি প্রাণীও শিলার বিকারে অংশগ্রহণ করে। মানুষও পথঘাট, বাঁধ বানাতে গিয়ে বা খনিজ পদার্থ উত্তোলনের সময় শিলাস্তরের পরিবর্তন ঘটায়। আবার গাছ বা মৃত প্রাণীর শরীরের অংশ পচে শিলাস্তরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফাটল ধরায়। যেহেতু এই ধরনের আবহবিকার জীব দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হয় তাই একে জৈববিকার বলে।

আবহবিকার সম্পর্কে এখন তোমাদের একটা সাধারণ ধারণা হয়েছে। পৃথিবীর নানারকম ভূমিরূপ গঠনেই শুধু আবহবিকারের প্রভাব নেই শিলাক্ষয়ের মাধ্যমে মাটি তৈরির কাজে এবং খনিজ পদার্থ সৃষ্টিতেও আবহবিকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আবার আবহবিকারের ফলে চূর্ণ শিলা বা আলগা হয়ে জমে থাকা শিলা মাধ্যাকর্ষণের ফলে যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ভৌতবিজ্ঞান

তাপের ঘটনাসমূহ

আমরা জানি যে, কঠিন পদার্থকে তাপ দেওয়ার ফলে পদার্থের প্রসারণ ঘটে এবং ঠান্ডা করলে সংকোচন হয়। কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের তুলনায় কঠিন পদার্থের প্রসারণ এত কম হয় যে খালি চোখে তা সবসময় বোঝা যায় না। কিন্তু পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয়।

আমরা দেখেছি যে, কখনও কখনও শিশির মুখে কাচের ছিপি এমন শক্তভাবে আটকে যায় যে, সহজে খোলা যায় না। শিশির মুখকে উত্তপ্ত করলে তাপের প্রভাবে শিশির মুখ বড় হয় কিন্তু কাচ তাপের কুপরিবাহী বলে ছিপি উত্তপ্ত হয় না এবং এর প্রসারণও হয় না ফলে, ছিপি শিশির মুখ থেকে আলগা হয়ে যায় ও সহজে খোলা যায়। আবার পুরু কাচের গ্লাসে গরম জল ঢাললে অনেক সময় গ্লাসটি ফেটে যায়। কাচ তাপের কুপরিবাহী বলে গরম জলের সংস্পর্শে আসায় গ্লাসের ভিতর দিক উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয় কিন্তু বাইরের অংশ সমপরিমাণ তাপ না পাওয়ায় খুব কম প্রসারিত হয়। একই পাত্রের বাইরে ও ভিতরে এই অসম প্রসারণের ফলে যে বলের উদ্ভব হয় তাতে কাচের গ্লাসটি ফেটে যায়। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয়। যা কোনও ক্ষেত্রে সুবিধাজনক আবার কোনও ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক।

একই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন হয়: একই পরিমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সব কঠিন পদার্থের প্রসারণ সমান হয় না। কোনওটির প্রসারণ কম হয় কোনওটির বেশি। দু'টি ভিন্ন ধাতুর একই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধযুক্ত পাতকে পাশাপাশি রেখে সাধারণ উষ্ণতায় রিভেট করে নিলে সেই ধাতবপাতের জোড়াটিকে দ্বি-ধাতব পাত বলে। সমান দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের একটি পিতলের পাত এবং একটি লোহার পাতকে সাধারণ উষ্ণতায় রিভেট করা হলে যুগ্মপাতটি সোজা অবস্থায় থাকে। এখন এই দ্বি-ধাতব পাতটিকে উত্তপ্ত করলে দেখা যাবে, পাতটি ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। এখন বুঝতে হবে যে, পিতল ও লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ একই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সমান হলে দ্বি-ধাতব পাতটি সোজাই থাকত। যেহেতু এদের প্রসারণ এক নয় তাই যুগ্মপাতটি বেঁকে যায়। এছাড়াও যদি বক্রতা লক্ষ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, পিতলের পাতটি বাইরের দিকে এবং লোহার পাতটি ভিতরের দিকে আছে। এ থেকে বোঝা যায় পিতলের দৈর্ঘ্য প্রসারণ লোহার থেকে বেশি। আবার এই দ্বি-ধাতব পাতটিকে যদি বরফের মধ্যে রাখা যায় তবে দেখা যাবে যে এটি এমন ভাবে বেঁকে গেছে যে, লোহার পাতটি বাইরের দিকে এবং পিতলের পাতটি ভিতরের দিকে আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, পিতলের দৈর্ঘ্য সংকোচন লোহার চেয়ে বেশি।

কঠিন পদার্থের তিনরকম তাপীয় প্রসারণ ঘটতে পারে, ক) দৈর্ঘ্য প্রসারণ বা রৈখিক প্রসারণ, খ) ক্ষেত্র প্রসারণ বা ক্ষেত্রফল প্রসারণ এবং গ) আয়তন প্রসারণ।

দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বা রৈখিক প্রসারণ গুণাঙ্ক: প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য কোনও কঠিন পদার্থের একক দৈর্ঘ্যে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রসারণ ঘটে তাকে ওই পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে।

ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক: প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য কোনও কঠিন পদার্থের একক ক্ষেত্রফলের যে পরিমাণ ক্ষেত্র প্রসারণ ঘটে তাকে ওই পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে।

আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক: প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য কোনও কঠিন পদার্থের একক আয়তনে যে পরিমাণ আয়তন প্রসারণ ঘটে তাকে ওই পদার্থের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে।

তরলের প্রসারণ: উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে কঠিন পদার্থের মতো তরল পদার্থেরও প্রসারণ ঘটে। তবে তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আকার না থাকায় এর দৈর্ঘ্য বা ক্ষেত্রফল প্রসারণ অর্থহীন। কেবলমাত্র আয়তন প্রসারণই অর্থপূর্ণ। নির্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সম আয়তনের বিভিন্ন তরলের প্রসারণ বিভিন্ন রকমের হয়।

যেহেতু তরল পদার্থকে সব সময়ই কোনও না কোনও পাত্রে রেখে উত্তপ্ত করা হয় তাই তাপ প্রয়োগের ফলে পাত্রেরও প্রসারণ ঘটে, সুতরাং পাত্রের প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে তরলের প্রসারণ বিবেচনা করতে হবে। পাত্রের প্রসারণকে অগ্রাহ্য করে তরলের প্রসারণকে বিবেচনা করলে তাকে তরলের আপাত প্রসারণ বলা হয়। তরলের আপাত প্রসারণের সঙ্গে পাত্রের যে অংশে তরল ছিল সেই অংশের প্রসারণ যোগ করে তরলের যে প্রসারণ পাওয়া যায় তাকে তরলের প্রকৃত প্রসারণ বলে।

অর্থাৎ, তরলের প্রকৃত প্রসারণ = তরলের আপাত প্রসারণ + পাত্রের প্রসারণ।

তরলের আয়তন প্রসারণ দু'ধরনের হওয়ার জন্য তরলের ক্ষেত্রে দু'টি আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক পাই। এক, আপাত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং দুই, প্রকৃত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক।

তরলের আপাত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক: প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে কোনও তরলের একক আয়তনে যে পরিমাণ আপাত আয়তন প্রসারণ হয় তাকে ওই তরলের আপাত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে।

কোনও পাত্রে রাখা তরলের আপাত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক পাত্রটির উপাদানের প্রসারণ গুণাঙ্কের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, কোনও তরলের আপাত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক তার নিজস্ব ধর্ম নয়। সুতরাং বিভিন্ন উপাদানের পাত্রে রাখলে একই তরলের আপাত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান বিভিন্ন হয়।

তরলের প্রকৃত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক: প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য কোনও তরলের একক আয়তনে যে পরিমাণ প্রকৃত আয়তন প্রসারণ হয় তাকে ওই তরলের প্রকৃত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে।

কোনও পাত্রে রাখা তরলের প্রকৃত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক পাত্রটির উপাদানের প্রসারণ গুণাঙ্কের ওপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ, তরলের প্রকৃত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক তার একান্ত নিজস্ব ধর্ম।

প্রিয় 'যুগশঙ্খ সাপ্লি'র পাঠক আপনারা ওয়েবসাইটের 'রিডার্স কমেন্ট'-এ কিংবা ই-মেইলে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত লিখে জানাচ্ছেন। আমরা ভীষণ খুশি। আমরা আপনাদের মতামত থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছি এবং আপনাদের চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।

আপনাদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ, আপনারা যাঁরা 'সাপ্লি' সংক্রান্ত মতামত জানাচ্ছেন, তাঁরা দয়া করে তাঁদের ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর জানাবেন। কারণ, আমরা আপনাদের সঙ্গে সরাসরি কথাও বলতে চাই।

(সাপ্লি টিম)

সচেতন পাঠক সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছেন
তাই তো রোজ বাড়ছে পাঠক সংখ্যা
যুগশঙ্খ
খবরের কাগজ, গল্পের নয়

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৩ মে ২০১৭

ক্যুইজ

১) গুপ্তযুগের নিউটন কাকে বলা হয়ে থাকে?
২) কাঙ্গের ভ্যালি জাতীয় উদ্যান কোন রাজ্যে অবস্থিত?
৩) কাজাখস্তানের জাতীয় খেলা কী?
৪) মাটিতে নাইট্রোজেনের সংবন্ধনে সাহায্য করে কে?
৫) পরিবেশের পরিবর্তন অনুভবকে কী বলে?
৬) অক্ষিগোলককে যান্ত্রিক আঘাত থেকে কে রক্ষা করে?
৭) উটপাখির লুপ্তপ্রায় অঙ্গটির নাম কী?
৮) বার কীসের একক?
৯) ক্ষুদ্র জলবিন্দু গোলাকার হয় কেন?
১০) কোন ভাইরাসের আক্রমণে গুটিবসন্ত হয়?
১১) মাম্পস কী ধরনের রোগ?
১২) যে আধানের প্রভাবে আবেশ সৃষ্টি হয়, তাকে কী বলে?
১৩) সিউডোমোনাস কী?
১৪) শৈবাল নিঃসৃত ক্ষতিকর টক্সিনের নাম কী?
১৫) কিলোহার্টজ কী পরিমাপের একক?
১৬) কোন বিজ্ঞানী সহজাত ও অর্জিত প্রতিবর্তক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেন?
১৭) ডায়াড কী?
১৮) পাখির ডানার পালককে কী বলে?
১৯) কোন বিজ্ঞানী আয়নীয় বন্ধনের ধারণা দেন?
২০) ছাপার ব্লক তৈরিতে কোন ধাতু ব্যবহৃত হয়?
২১) লোহার ওপর মরচে পড়া কী ধরনের প্রক্রিয়া?
২২) কোন ধরনের শর্করা সবথেকে বেশি মিষ্টি?
২৩) দৌলতাবাদ দুর্গ কোথায়?
২৪) কোন বিজ্ঞানী প্রেসার কুকার আবিষ্কার করেন?
২৫) কোন বিজ্ঞানী প্রথম জিন কথাটির প্রচলন করেন?
২৬) পৃথিবীর একটি অদৃশ্য দ্বীপের নাম কী?
২৭) পৃথিবীর জলরাশির চক্রাকারে আবর্তনকে কী বলে?
২৮) মাটির ভিতর সঞ্চিত জলকে কী বলে?
২৯) একটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এর নাম কী?
৩০) বায়ুচাপ মাপার একক কী?
৩১) পলল শঙ্কু কোথায় দেখা যায়?
৩২) ইংল্যান্ডে কোন শিল্পে প্রথম বিপ্লব ঘটেছিল?
৩৩) লিডস কী জন্য বিখ্যাত?
৩৪) বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি দেখা যায়?
৩৫) অনুদৈর্ঘ্য ও পার্শ্বীয় বিকৃতির অনুপাতকে কী বলে?
৩৬) আর্মেচার কী?
৩৭) জলমধ্যস্থ শব্দ পরিমাপের যন্ত্রটির নাম কী?
৩৭) পরপর দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশকে কী বলে?

৩৮) টেপ রেকর্ডারের শব্দ কোথা থেকে উৎপন্ন হয়?
৩৯) কোন পদার্থকে অজৈব গ্রাফাইট বলে?
৪০) তারপিন তেল কোন গ্যাস শোষণ করে?

উত্তর: ১) আর্যভট্ট। ২) ছত্তিশগড়। ৩) বক্সিং। ৪) নীলাভ সবুজ শৈবাল। ৫) সংবেদন। ৬) নেত্রবর্ত্মকলা। ৭) ডানা। ৮) বায়ুমণ্ডলীয় চাপের। ৯) জলের পৃষ্ঠটানের জন্য। ১০) ভ্যারিওলা। ১১) ভাইরাসঘটিত। ১২) আবেশি আধান। ১৩) ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া। ১৪) নিউরোটক্সিন। ১৫) শব্দের কম্পাঙ্ক। ১৬) বিজ্ঞানী ইভান পেত্রোভিচ প্যাভলভ। ১৭) দুটি ক্রোমোটিডযুক্ত ক্রোমোজোম। ১৮) রেমিজেস। ১৯) বিজ্ঞানী কোসেল। ২০) জিংক ধাতু। ২১) তড়িৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়া। ২২) ফ্রুক্টোজ। ২৩) মহারাষ্ট্রে। ২৪) ডেনিস পেপিস। ২৫) বিজ্ঞানী জোহানসেন। ২৬) ঘোড়ামারা। ২৭) জলচক্র। ২৮) ভৌমজল। ২৯) টর্নেডো। ৩০) মিলিবার। ৩১) পর্বতের পাদদেশে। ৩২) বস্ত্র শিল্পে। ৩৩) পশম দ্রব্যের জন্য। ৩৪) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। ৩৫) পোয়াঁসের অনুপাত। ৩৬) বৈদ্যুতিক মোটরের অংশ। ৩৭) হাইড্রোফেন ৩৭) লুপ। ৩৮) চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে। ৩৯) বোরন নাইট্রাইটকে। ৪০) ওজন।

জেনারেল নলেজ

পৃথিবীর ভয়ংকর কিছু স্থান

সমুদ্র, পাহাড়, বন ও আকাশ ঘেরা এই পৃথিবীতে কত কিছুই না আছে। কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো দেখলে রোমাঞ্চকর, আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত বলে মনে হয়। আবার এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো দেখলে গা শিউরে ওঠে। আজ আমরা পৃথিবীর ভয়ংকর কিছু স্থান সম্পর্কে জানব।

খুনি হ্রদ: সুন্দর এই পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য হ্রদ বা জলাশয়গুলোর বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

অনেকেই অবকাশ যাপনের জন্য বেছে নেন হ্রদবেষ্টিত কোনও স্থানকে। তবে ক্যামেরুনে রয়েছে এমন একটি হ্রদ যাতে অবকাশ যাপন তো দূরের কথা এর ২৩ মাইলের মধ্যে গেলেই মারা যেতে পারেন। স্থানীয়ভাবে এই হ্রদটিকে বলা হয় 'Killer Lake' বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় 'খুনি হ্রদ'। তবে এর আসল নাম 'নয়োজ' (NYOS)। ১৯৮৬ সালে এই হ্রদ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর বুদবুদ বার হওয়া শুরু করে। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড সালফার ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। সে সময় এই গ্যাসের প্রভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রায় ১,৭০০ মানুষ ও ৩,৫০০ গবাদিপশু মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল তাদেরও দীর্ঘমেয়াদি কষ্টকর পার্শপ্রতিক্রিয়া যেমন ক্ষত, টিস্যু পোড়া এবং শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা প্রভৃতিতে ভুগতে হয়েছিল। এরপর থেকেই এই হ্রদটির নাম হয়ে যায় 'খুনি হ্রদ'। এরকমটি হওয়ার কারণ হল, এটি একটি মৃত আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখের পাশে অবস্থিত। এর উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হলেও এটি লাভায় পরিপূর্ণ এবং এর মধ্য থেকেই কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। পর্বতের এই অংশটি ওক পর্বতমালার অন্তর্গত যা ক্যামেরুনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত।

শ্যাম্পেন লেক: নাম শুনে মনে হতে পারে এই লেকের জল থেকেই বোধহয় শ্যাম্পেন হয়। আসলে তা নয়। এই লেকের জল থেকে শ্যাম্পেন না হলেও এই লেকের

জল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের বুদবুদ বের হওয়ার ধরন অনেকটা শ্যাম্পেনের বোতল খোলার পর যে রকম বুদবুদ করে ভিতর থেকে শ্যাম্পেন বেরিয়ে আসে সেরকম। এই কারণে এটিকে শ্যাম্পেন লেক বলা হয়। নিউজিল্যান্ডের Wai-O-Tapu তে অবস্থিত। Wai-O-Tapu জায়গাটি আবার রুটুরুয়াতে অবস্থিত। মাউরি ভাষা থেকে অনুবাদ করলে জানা যায় Wai-O-Tapu-র অর্থ হচ্ছে পবিত্র জল অথবা রঙিন জল আর রুটুরুয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে কাহুমাতামমিও, যে ছিল লর্ড মারিওর কাকা যিনি এই অঞ্চলটি আবিষ্কার করেছেন। পুরো রুটুরুয়া অঞ্চলটিই তীব্র ভাবে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি, জল ও বাষ্প ও আরও বহু অদ্ভুত প্রাকৃতিক বৈশিষ্টে গঠিত ও পরিপূর্ণ।

বিয়ার লেক আরোরা: শ্যাম্পেনের পরই আসছে বিয়ার লেক অরোরা। এই লেকটি আলাস্কায় অবস্থিত। আর অরোরা বলতে বুঝায় বিয়ার লেক-এর আকাশের মনোরম রঙিন আলোর খেলা। এটাকে উত্তরের আলো বা (Northan Light)ও বলা হয়। বিয়ার লেক অরোরা প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি। আকাশের এই রঙিন খেলাকে নিয়ে আছে অনেক লোককথা। এর ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। প্রাচীন লোককথা থেকে জানা যায়, এই অনিন্দ্য সুন্দর আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করেছিল রোমান সূর্যোদয়ের দেবতা অরোরা (Aurora)। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে যে সূর্যবায়ু সঙ্গে যখন পৃথিবীর

চৌম্বকক্ষেত্রের সংঘর্ষ ঘটে তখনই এই রহস্যময় আলোর উৎপত্তি হয়।

নরকের দরজা: ভয়ংকর এই স্থানটি তুর্কমেনিস্তানের কারা-কুর মরুভূমির দারভাযা গ্রামের পাশে অবস্থিত। ১৯৭১ সালের তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি কোম্পানি গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য খনন কাজ চালায়। তখনই ঘটে এক বিশাল বিস্ফোরণ। বন্ধ হয়ে যায় গ্যাসক্ষেত্রটি। মারা যায় অনেক লোক। আর সৃষ্টি হয় বিশাল আগুনে ভরা বড় বড় গর্ত। আর এই বিশাল গর্ত থেকে ক্রমাগত নির্গত হচ্ছে মিথেন গ্যাস আর তার থেকে আগুন। এই আগুনের তাপ এত বেশি যে তার পাশে ২ মিনিটের বেশি দাঁড়ানো সম্ভব নয় কিছুতেই। আর এরপর থেকেই স্থানটির নাম 'নরকের দরজা'।

রেসট্রাক প্লায়া: আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে মৃত্যু উপত্যকায় অবস্থিত এই স্থানটি আমেরিকানদের কাছেই এক রহস্য। এই স্থানটির সবচেয়ে রহস্যময় বিষয় হল এর বুকে ভেসে বেড়ানো পাথরগুলো। কীভাবে এই পাথরগুলো ভেসে ভেসে এসেছে তার কোনও কুলকিনারা কেউ করতে পারেনি। এই ভেসে বেড়ানোর কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে বায়ুপ্রবাহ। শীতকালে যখন এই মরুভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন race-track playa খুব পিচ্ছিল হয়ে প্রবল বায়ু প্রবাহের ফলে পাথরগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়।

ওয়াদি জিন: ২০০৯-২০১০ সালের দিকে সৌদি সরকার এই ওয়াদি জিন নামক স্থান দিয়ে একটি রোড বানানোর পরিকল্পনা করে। কিন্তু কাজ ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত করার পর সমস্যা শুরু হয়। হঠাৎ দেখা যায় কাজ করার যন্ত্রপাতি আস্তে আস্তে মদিনা শহরের দিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাচ্ছে। যেন কেউ যন্ত্রপাতিগুলো মদিনার দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কে পাঠাচ্ছে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। পিচ ঢালাই করার জন্য বড় বড় রোলার গাড়িগুলো বন্ধ থাকলেও আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠতে থাকে এবং মদিনা শহরের দিকে নিজে নিজে চলতে শুরু করেছে। শোনা যায় এমনকী পেপসির বোতল জলের বোতল এবং যে জল রাস্তায় ফেলা ছিল সেগুলোও নীচের দিকে না গিয়ে উপরে মদিনার দিকে যাওয়া শুরু করে দিয়েছে। এই সব দেখে কর্মরত শ্রমিকরা ভয় পেয়ে যায়। তারা কাজ করতে অস্বীকার করে। রাস্তাটির কাজ যেখানে বন্ধ করা হয় সেখানে চারদিকে বিশাল বিশাল কালো কালো পাহাড়। ওখানেই শেষ মাথায় গোল চক্করের মতন করে আবার সেই রাস্তা দিয়েই মদিনা শহরে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌদি নাগরিকরা সহজে কেউ এই স্থানটিতে যেতে চায় না। ওয়াদি জিন জায়গাটির অবস্থান মদিনার আল বায়দা উপত্যকায়। উপত্যকাটি মসজিদ-এ-নবীর উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

স্নেক আইল্যান্ড: ব্রাজিলের স্নেক

আইল্যান্ড। চার লক্ষ ৩০ হাজার বর্গমিটার আয়তনের দ্বীপটিতে বছরের পর বছর ধরে রাজত্ব করে চলেছে গোল্ডেন ল্যান্সহেড নামের ভয়ংকর বিষধর এক প্রজাতির সাপ। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত আছে, দ্বীপটির প্রতি বর্গমিটার এলাকায় পাঁচটি করে সাপের দেখা মেলে। ব্রাজিলের নৌবাহিনী এই দ্বীপটিতে সাধারণের চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

শ্বেত মরুভূমি: মিশরের ফারাফ্রা মরূদ্যানের ৪৫ কিলোমিটার উত্তরে এই শ্বেত মরুভূমিটি অবস্থিত। মরুভূমিটিকে দেখে অবাস্তব মনে হলেও এটিই বাস্তব। অনেক বছর আগে সাহারা মরুভূমি জলের নীচে ডুবে ছিল। সে সময় সাহারা মরুভূমির একটি অংশে খড়িমাটি জমতে থাকে। খড়িমাটি জমতে জমতে একসময় এই অংশটুকু জলের উপরে ভেসে ওঠে। জমে থাকা এই খড়িমাটি থেকেই এই শ্বেত মরুভূমির সৃষ্টি।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৩ মে ২০১৭

পড়াশোনার নিয়মকানুন

পড়াশোনা শুধু ভালো লাগলেই হয় না। তাতে মনোযোগ সঠিকভাবে বিষয় অনুধাবন করা ও সঠিক পরিকল্পনামতো চললে পড়াশোনায় মনের মতো সাফল্য পায়া যায়। Survey (অনুসন্ধিৎসু মন), Question (জিজ্ঞাসা), Read (পড়া), Recite (বারে বারে পড়া), Review (একই বিষয়কে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়া)-এদের মতো আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলো ছাত্রজীবনে মেনে চললে পড়াশোনায় উপকার হয়।

পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হলে বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই দক্ষ হতে হবে। ব্যকরণের প্রতি নজর দিতে হবে। এর জন্যে নিয়মিত চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। নির্ভুল বানান, সুন্দর ও ঝকঝকে খাতা বেশি নম্বরের নিশ্চয়তা দেয়। ব্যকরণে দুর্বলতা নিজে কিছু লেখার ব্যাপারে ভীতি তৈরি করে।

জীবনে কিছু পেতে গেলে তার পিছনে লেগে থাকতে হয়। পড়াশোনার বিভিন্ন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্যে লেগে থাকতে হবে। প্রয়োজনে বড়দের বা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের উপায় বার করে সেই চেষ্টা করে যেতে হবে।

সারক্ষণ বই মুখে করে অমনোযোগী হয়ে পড়ার চেয়ে অল্প সময় মন দিয়ে পড়া উত্তম। শুধু পড়া নয় লেখাও মন দিয়ে করতে হবে। পড়ার পরেই সেটা লিখতে হবে।

গ্রুপ স্টাডি লেখাপড়া করা অনেক সময়েই খুব কার্যকরী। এতে যা আলোচনা হয় তা খুব ভালো মনে থাকে। একে ডিসকাস থেরাপিও বলা হয়। লেখাপড়ায় সফলতা অর্জনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই কার্যকর।

মানসিক জোর বা ইতিবাচক চিন্তা শিক্ষাজীবনে যাই সমস্যা আসুক তা সমাধান করতে ক্ষমতা দেয়। হতাশ না হয়ে, সবসময় ইতিবাচক চিন্তা করলে, চেষ্টা ও বিশ্বাস থাকলে তা ছাত্রছাত্রীদের জীবনের অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

বিশৃঙ্খলতায় জীবনে কখনও সফলতা আসে না। নিজের জন্যে উপযুক্ত রুটিন তৈরি করে সে অনুযায়ী চলতে হবে। রুটিন বানানোর সময়ে স্কুল, গৃহশিক্ষকের রুটিন, বাড়িতে পড়ার, খেলাধুলার, অবসর সব কিছুর জন্যে সময় বরাদ্দ করতে হবে।

টিচার যে পড়াটি পড়াবেন তা আগেই অন্তত একবার পড়ে রাখলে, পড়া সহজেই বুঝতে পারা যায়। কোনও প্রশ্ন জানার থাকলে পড়ানোর সময়ে তা জেনে নেওয়া যায়।

সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে, পরে করার কথা মাথায় রেখে কোনও কাজ ফেলে রাখলে তা নিজের ক্ষতি করবে। অযথা চাপ বাড়বে। তাই পড়া বা এই সংক্রান্ত কোনো কাজ জমিয়ে না রেখে শেষ করে ফেলতে হবে।

পড়াশোনায় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হয়। পড়ার সঙ্গে খাওয়া, রিফ্রেশমেন্টের খেয়াল রাখতে হবে। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণের খাবার খাওয়া ও বিশ্রাম নিতে হবে।

বারে বারে মক টেস্ট দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষা দেওয়ার আগে নিজে নিজে পরীক্ষা দিতে হবে। এটিকে পরীক্ষার মহড়াও বলা যেতে পারে। এতে নিজের ভুল ত্রুটি ধরা পড়বে। তা শুধরে নেওয়া যাবে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় A+ পেতে হালে প্রতিটি বিষয়ে সমান ভাবে দক্ষ হতে হবে। তাই বেছে বেছে বা নিজের পছন্দমতো বিষয়ে বেশি সময় দিলে আখেরে নিজের ক্ষতি হবে।

পড়ার সময় কিছু ছোটখাটো কিন্তু দরকারি বিষয় মেনে চললে বেশ লাভ হয়। যেমন আওয়াজ করে পড়লে বেশি ভালো মনে থাকে। কারণ তা পড়ার সঙ্গে শোনা হয়ে যায়। প্রতিটি বিষয়ের সারাংশ বোঝার চেষ্টা করা, বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দাগ দেওয়া বা নোট করা-র অভ্যেস কম সময়ে পড়া তৈরি করতে সাহায্য করে। অবশ্যই একাধিক বই পড়তে হবে। সহজ ও কঠিন বিষয় পড়ার সময় প্রয়োজনমতো সময় কম-বেশি করতে হবে।

সুন্দর হাতের লেখার প্রশংসা সবাই করে। লেখা পরিষ্কার ও স্পষ্ট হলে শিক্ষকের মূল্যায়নে সুবিধে হয়। তাঁরও লেখা পড়তে ইচ্ছে করে। শিক্ষাক্ষেত্রের সকল স্তরেই হাতের লেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে বাড়িতে লেখার অভ্যেস খুব উপকারে আসে।

ছাত্রজীবনে ভালো ফলাফল করতে হলে সঠিক নিয়মে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। পড়া-শোনার ব্যাপারে কৌশলী ও নিয়ম মেনে চলতে হয়। Robinson অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছেন। তার পদ্ধতিকে বলা হয় S Q 3 R পদ্ধতি। অধ্যয়নকালে এই কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করলে অবিশ্বাস্য ফলাফল পাওয়া যায়।

পড়াশোনায় মনের জোর আনতে মেডিটেশনের ভূমিকা

আমি কি পারবো?

ছাত্রজীবনে দীর্ঘসূত্রিতার একটি প্রধান কারণ হল কাজটি আমি পারব' —এ বিশ্বাস করতে না পারা। যখন একজন শিক্ষার্থী কোনও বিশেষ বিষয়ে নিজেকে দুর্বল মনে করে তখন সেটি শুরু করাটা তার জন্য চ্যালেঞ্জিং। যেমন লেখালিখির ব্যাপারে হয়তো তোমার মধ্যে জড়তা আছে। এখন যদি এমন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট থাকে যাতে নিজের আইডিয়াগুলোকে লিখে প্রকাশ করতে হবে, তাহলে তোমার মধ্যে গড়িমসি দেখা যাবে।

এক্ষেত্রে সমাধান হল মেডিটেশনের মাধ্যমে তোমার অবচেতন মনের ভয় বা অনিশ্চয়তাকে বের করে আনা। সমস্যাগুলোকে শনাক্ত করো। এবং নতুন যোগ্যতা, দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করো। এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে এমন কারও সঙ্গে যোগাযোগ করো সবসময় মনে করবে তোমার চেয়ে কম মেধার অনেক মানুষ যদি এটা পেরে থাকে তবে তুমি কেন পারবে না?

কিছু কথা মনে রাখার চেষ্টা করো—

- একটানা কাজের রুটিন করবে না। যেরকম বিকেল ৫.০০ থেকে রাত ৯.০০ পর্যন্ত পড়া। এরকম না করে প্রথম ১ ঘণ্টা পড়ার পর চা খাওয়ার ৫ মিনিট বিরতি, দ্বিতীয় ঘণ্টার পর ৫ মিনিট একটু হাঁটাহাঁটির বিরতি রাখা যেতে পারে।
- পড়াশোনার ফাঁকে বিরতিতে টিভি দেখা, কম্পিউটার গেমস, ফেসবুক, বন্ধুকে ফোন এগুলো রাখা যাবে না।
- ভারি খাওয়াদাওয়া বা প্রিয় টিভি সিরিয়াল দেখার ঠিক পরপরই পড়তে বসবে না। এতে মনোযোগে সমস্যা হয়।
- পরপর কয়েকদিন রুটিনে লাল দাগ পড়লে হতাশ হয়ে পড়বে না। বরং তিনদিন এরকম হলে শাস্তিস্বরূপ চতুর্থ দিন প্রিয় সিরিয়ালটি বা গেমসটি বন্ধ করো। নিজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করলে নিজেই উপকৃত হবে।
- নিজের দৈহিক ছন্দের বিরুদ্ধে রুটিন করবে না। যদি রাতে মাথা ভালো কাজ করে তবে রাতে পড়াশোনার সময় বেশি রাখো। অন্যান্য কাজগুলো দিনে করার চেষ্টা করো

মাও সে তুং বলেছিলেন, যুদ্ধ হয় একটার পর একটা। শত্রুশক্তি ধ্বংস করা যায় একের পর এক। কলকারখানা তৈরি হয় একটার পর একটা। চাষিরা চাষ করে একের পর এক প্লট। আমরা যে খাবার শেষ করতে পারব তাই নিই, কিন্তু অল্প অল্প করেই আমরা তা শেষ করি। সমস্ত খাবার একসঙ্গে খাওয়া অসম্ভব। একেই পিসমিল সলিউশন বলে।

অর্থাৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হয় একটু একটু করে। এ লক্ষ হতে পারে বড় কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়া, মাধ্যমিকে স্টার মার্কস পাওয়া। অথবা টার্ম পেপার রেডি করা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই চেষ্টা করো একটু একটু করতে। একদিনে বসেই ফিজিক্স সিলেবাস শেষ করার চাইতে এক মাস ধরে প্রতিদিন একটানা অর্ধেক চ্যাপ্টার পড়তে পারলে উপকৃত হবে বেশি। কাজেই রুটিনকেও সেইমতো সাজাও। পরীক্ষার তারিখ হাতে পাওয়ার দিনই সতর্ক হও। পরদিন থেকেই ওই বিষয়ের জন্য ১/২ ঘণ্টা সময় বাড়তি রাখো তাহলে আর পরীক্ষার আগের দিন মাথার চুল ছিঁড়তে হবে না।

তুমি কি সত্যিই চাও?

ভাবছ এ আবার কেমন প্রশ্ন? চাইব না কেন? সফল হতে কে না চায়? চায় সবাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের কাছে সফল হতে চাওয়াটা শুধু চাওয়াতেই সীমাবদ্ধ। তারা চান মাঝে মাঝে পড়ালেখা করব, টিভি-সিনেমা দেখব, আড্ডা দেব, গান শুনবো, গল্পের বই পড়ব। তারপর যদি এ প্লাস না পাই তাহলে কী আর করা। জীবনটাকে তো উপভোগ করতে হবে! কিন্তু একজন ফার্স্টবয় বা ফার্স্টগার্ল কি এভাবে ভাবে? ভাবে না। তার কাছে ফার্স্ট হওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যে যা করা দরকার, যেভাবে করা দরকার এবং যা বর্জন করা দরকার সে তা-ই করে।

নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে সাফল্যের ছবি আমি দেখছি সে সাফল্যকে বরণের প্রস্তুতি কি আমি নিচ্ছি?আর এ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সচেতন হও এ সময়খাদকগুলোর ব্যাপারে।

বন্ধুর ফাঁদ পাতা ভুবনে

ছাত্রজীবনে বন্ধুদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারও কারও জীবন প্রভাবিত হয় প্রধানত বন্ধুদের দ্বারাই। যার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ বেশি হবে তার দ্বারাই তুমি প্রভাবিত হবেন বেশি। অধিকাংশের জীবনধারা তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মতোই হয়। তোমার বন্ধুরা যদি মেধাবী,সহানুভূতিশীল সু-স্বাস্থ্য ও সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, তাহলে তোমারও তা অর্জন করার সম্ভাবনা থাকবে। তোমার বন্ধুরা যদি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বা রূঢ় আচরণে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ্যহীন জীবনে ভেসে বেড়াতে থাকে, ড্রাগ, ধূমপান ও অন্যান্য বদ অভ্যাস বা অনাচার-অত্যাচারে লিপ্ত থাকে তাহলে এ ধরনের বন্ধুরা তোমার জীবনের লক্ষ্য থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে পারে। কোনও বন্ধু যদি তোমার জন্য আনন্দের কারণ না হয়, যদি বেশিরভাগ সময়ই তার সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে কেটে যায়, তাহলেও তোমার আচরণে কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। হয় তার সঙ্গে দেখা করার সময় কমিয়ে দাও বা কীভাবে তার সঙ্গে মতৈক্য সৃষ্টি করা যায় তা খুঁজে বের করো কারণ, ক্রমাগত মতানৈক্য তোমার মানসিক প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারে।

আসলে সহপাঠী মানেই বন্ধু নয়। সুসম্পর্ক থাকবে সবার সঙ্গে কিন্তু বন্ধুত্ব হবে তাদের সঙ্গেই যাদের জীবন চেতনা ও লক্ষ্যের সঙ্গে তোমার মিল রয়েছে। আর সবসময় সসঙ্গে থাকো। সৎ চেতনায় সংঘবদ্ধ মানুষই জীবনে শ্রেষ্ঠ হয়।

পড়াশোনার একঘেয়েমি কাটিয়ে নাও

পিকলু আগের সপ্তাহে বাবা-মায়ের সঙ্গে চিন থেকে ঘুরে এল।
বাড়ি ফেরার পর থেকেই পিকলুর মা লক্ষ করল, পিকলু সারাক্ষণ চুপচাপ থাকছে, আর ভাবছে।
কয়েকদিন পর পিকলুর মা আর থাকতে না পেরে পিকলুকে জিগ্যেস করল, পিকলু চিন থেকে ঘুরে আসার পর থেকে তুই কী এত ভাবছিস বল তো?
পিকলু: আচ্ছা মা, আমাকে কি দেখতে বিদেশিদের মতন লাগে?
পিকলুর মা এই কথা শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে বলল, না তো। তোকে তো কোনও অ্যাঙ্গেল থেকেই বিদেশি লাগছে না!
পিকলু এই কথা শুনে খুবই নিশ্চিন্ত হয়ে মাকে বলল, চাইনিজগুলোর মাথায় একফোঁটাও বুদ্ধি নেই! আমরা যখন চিনে গেছিলাম, তখন সেখানকার লোকেরা আমাকে দেখে, ফরেনার বলছিল। আমিও শুধু শুধু এতদিন ধরে এটা নিয়ে চিন্তা করলাম!

.....

ইতিহাস ক্লাসে স্যার বাবলুকে জিগ্যেস করলেন, বলো তো, আকবর জন্মেছিলেন কবে?'
বাবলু: স্যার, এটা তো বইয়ে নেই!
স্যার: কে বলেছে বইয়ে নেই! এই যে আকবরের নামের পাশে লেখা আছে ১৫৪২-১৬০৫!
বাবলু: ও! ওটা জন্ম-মৃত্যুর তারিখ? আমি তো ভেবেছিলাম ওটা আকবরের ফোন নম্বর। তাই তো বলি, এতবার ট্রাই করলাম, রং নম্বর বলে কেন!

.....

একদিন ক্লাসে শিক্ষক তার সোনার আংটিটা একটা গ্লাসের জলে ডুবিয়ে ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন, বল তো, এই আংটিটাতে জং ধরবে কি না?
ছাত্র: ধরবে না স্যার।
শিক্ষক: গুড, ভেরি গুড। কেন ধরবে না বলো তো?
ছাত্র: স্যার, আপনি জ্ঞানী লোক। জলে রাখলে আংটিতে যদি জং ধরত, তাহলে আপনি কখনোই আপনার সোনার আংটি জলে রাখতেন না।

.....

শিক্ষক: বলো তো, কোনটি আমাদের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, সূর্য না চাঁদ?
ছাত্র: চাঁদ, স্যার।
শিক্ষক (অবাক হয়ে): কেন?
ছাত্র: চাঁদ আমাদের রাতে আলো দেয় যখন আমাদের প্রয়োজন হয় কিন্তু সূর্য দিনে দেয় যখন আমাদের প্রয়োজন নেই।

.....

স্যার ছাত্রকে প্রশ্ন করছে।
স্যার: মিঠু, বলো তো গোরু আমাদের কী দেয়?
মিঠু: গুঁতো দেয় স্যার!!

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৩ মে ২০১৭

জেনারেল নলেজ

‘লিটল বয়’ ও ‘ফ্যাটম্যান’

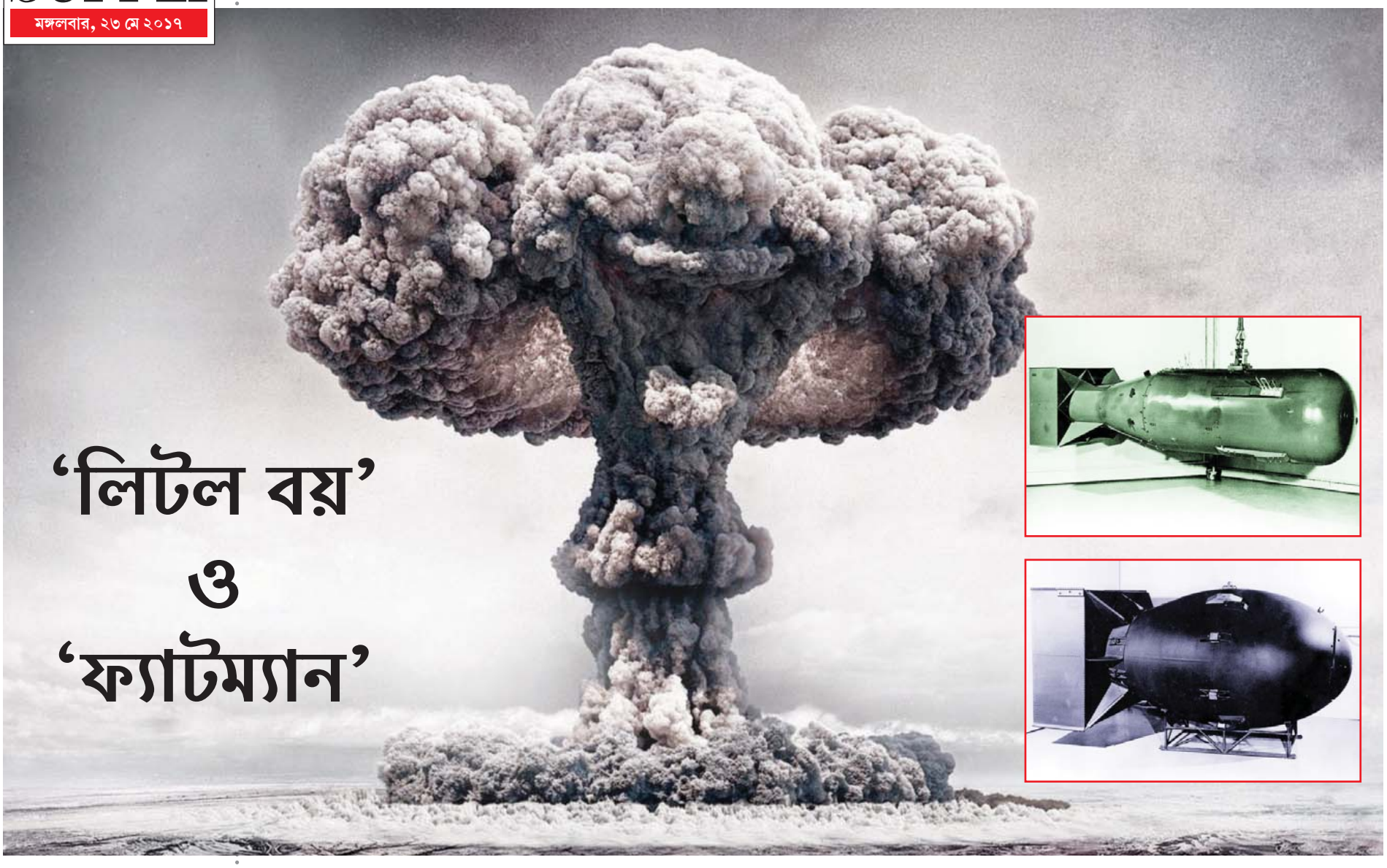

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সভ্যতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সভ্যতার উন্নতির ভয়াবহ একটি দিক হল, সামরিক বাহিনীতে ব্যবহার করা উন্নত প্রযুক্তির মারণাস্ত্র। এর মধ্যে পারমাণবিক বোমা হল বিজ্ঞানের সবচেয়ে ভয়ংকর সৃষ্টি। এক নিমেষেই যেটি কিনা ধ্বংস করে দিতে পারে একটি সাজানো সুন্দর শহর কিংবা দেশ। জাপানের সবচেয়ে বৃহৎ দ্বীপ ‘হিরোশিমা’ পারমাণবিক বোমার নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর গত ৭২ বছর ধরে বয়ে নিয়ে চলেছে।

সালটা ১৯৪৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় শেষদিকে, ৬ আগস্ট, সে সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর নির্দেশে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ট্রিনিটি মার্কিন বিমান ঘাটি থেকে বি-২৯ বিমানটি ৯০০০ পাউন্ডের ২০,০০০ টন বিস্ফোরক টিএনটির সমান ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পন্ন ‘ইডরেনিয়াম-২৩৫’ বোমা নিয়ে রওনা হয়। এবং ঠিক সকাল ৮.১৫ মিনিটে ‘লিটল বয়’ নামক পারমানবিক বোমাটি আমেরিকান বিমান বাহিনীর ‘ইনোলা গে’ নামক এই ‘বি-২৯’ বোম্বার থেকে জাপানের হিরোশিমা নগরীর উপর ফেলা হয়।

অপারেশন অফিসার ছিলেন মেজর জেমস হপকিন্স। বিমানটির ক্রু যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দেখেছিলেন বোমাটি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র দাবানলের ক্রমবর্ধমান ধোয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ‘ট্রিনিটি টেস্ট’ নামে পরিচিত এই ঘটনাটিকে আমেরিকানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমা তৈরির ক্ষেত্রে বিজয় হিসেবে দেখেছিলেন।

হিরোশিমা ছিল আমেরিকানদের জন্য গবেষণাগার আর হিরোশিমার নিরীহ মানুষজন ছিলেন গিনিপিগ। বোমাটির বিস্ফোরিত হওয়ার পর ওয়াশিংটন থেকে আবার একটি দল জাপানে পাঠানো হয়েছিল প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। একটি মাত্র সাক্ষাৎকারই ইংরেজিতে ছিল, যেটি দিয়েছিলেন একজন রাশিয়ান মহিলা। পাঁচ মিনিটের এই সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছিল, তিনি হিরোশিমা শহরের কাছেই ছিলেন এবং দেখতে পেয়েছিলেন কীভাবে পারমাণবিক বোমার ঝাঁঝ হিরোশিমার নগরবাসীকে পুড়িয়ে দিয়েছিল, মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল দালানকোঠা।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে জানা যায়, সকাল ৮.১৫ মিনিটে জাপানের ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের টোকিও নিয়ন্ত্রণ অপারেটর লক্ষ করেন, হিরোশিমা স্টেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং তিনি অন্য একটি টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে প্রোগাম পুনরায় চালু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটিও কাজ করে না। প্রায় ২০ মিনিট পরে টোকিও রেলপথ টেলিগ্রাফ কেন্দ্র বুঝতে পারে উত্তর হিরোশিমার টেলিগ্রাফের প্রধান লাইনটি কাজ করছে না। এরই মধ্যে শহরের দশ মাইলের ভিতরে বেশ কয়েকটি রেলপথ বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে বিভ্রান্তিকর ও ভয়ংকর একটি বিস্ফোরণের খবর আসতে থাকে শহরের আশপাশ থেকে। যেগুলো জাপান জেনারেল স্টাফদের সদর দফতরে প্রেরণ করা হয়। সামরিক সদর দফতর বারবার হিরোশিমার সেনাবাহিনীর কন্ট্রোল স্টেশনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সবদিক থেকে হিরোশিমার সঙ্গে যোগাযোগে ব্যর্থ সদর দফতরের মানুষজন ধাঁধায় পড়ে যান। সদর দফতর থেকে তখনই বিমানবাহিনীর একজন তরুণ অফিসারকে হিরোশিমা গিয়ে সার্বিক অবস্থা খতিয়ে দেখে নির্ভরযোগ্য তথ্য আনার নির্দেশ দেওয়া হয়। সদর দফতর তখন পর্যন্ত ভেবেছিল এগুলো সবই গুজব।

এই বিস্ফোরণের বিকিরণে আহত হয়ে প্রায় এক লক্ষ মানুষ অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অন্যদিকে, বিস্ফোরণের ক্ষত নিয়ে সংখ্যায় খুব কম মানুষই বেঁচে ছিলেন। তবে তাঁদেরও কারও হাত ছিল না, কারও পা ছিল না, কারও আবার চোখ ছিল না। বিকিরণের পরবর্তী যে ক’জন শিশু জন্ম নিয়েছিল তারা সবাই ছিল বিকলাঙ্গ নয়তো প্রতিবন্ধী নয়তো বা কিছু না কিছু অসুখ জর্জরিত।

কিন্তু ভয়াবহতা এখানেই শেষ ছিল না। ওই বছরই হিরোশিমা আক্রমণের ঠিক দু’দিন পর অর্থাৎ ৮ আগস্ট রাত ৩.৪৭ মিনিটে জাপানের আরেকটি ব্যস্ত শহর নাগাসাকিতে ‘ফ্যাটম্যান’ নামের অন্য একটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বোমাটি বিস্ফোরণ ঘটে নিমিষে একটি ব্যস্ত শহরকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে দেয়। ঘোর নিদ্রায় মগ্ন নাগাসাকিবাসীরা চিরনিদ্রায় বিলীন হয়ে যান। এই বোমা দু’টির তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর মিছিলে শামিল হন প্রায় আরও এক লক্ষ দশ হাজার নিরীহ জাপানি। দীর্ঘমেয়াদি তেজস্ক্রিয়ার কারণে পরের বেশ কয়েকটি বছর ক্রমাগতভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আরও এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মানুষ। এখনও জাপানের অদিবাসীরা সেই তেজস্ক্রিয়ার মাশুল দিয়ে যাচ্ছেন। আণবিক বোমা লিটল বয়ের ধ্বংসযজ্ঞ এতটাই নির্মম ছিল যে, সেদিন এই বোমাটির দুই কিলোমিটারের মধ্যে যতগুলো কাঠের বাড়ি ছিল সব মাটির সঙ্গে মিশে যায়। যেখানে লিটল বয় বিস্ফোরিত হয়েছিল, সেটি ছিল সমতল জায়গা। নানা ধরনের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক ঘর ছিল অগণিত। সেখানে ৫০০ মিটার বৃত্তের মধ্য আলিশান ঘরগুলো চোখের পলকে পুড়ে ছাই হয়। পাঁচ বর্গমাইল এলাকা মোটামুটি ভস্ম এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার সময় হিরোশিমা নগরীর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। সেই সময় থেকে ১০ আগস্ট অর্থাৎ চার দিনের মাথায় মৃত্যু মুখে পড়েন পায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৬৪ জন। এক তথ্যে জানা যায়, একই সময়ে প্রায় বিশ হাজার সামরিক লোকও মৃত্যু বরণ করেন। মোট কথা আণবিক বোমা পায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার জাপানি মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।

ওই নিউক্লিয়ার অ্যাটাকের ৭২ বছর কেটে গেলেও, আজ পর্যন্ত জাপানের মানুষ ভুলতে পারেন না সেই ভয়াবহ ইতিহাস। শোনা যায়, হিরোশিমা ও নাগাসাকির যে জায়গায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এখনও সেখানে নাকি ঘাস ওঠেনি। এর থেকেই অনুমেয় বোমাগুলি কতটা শক্তিশালী ছিল। জাপানে একটি জাদুঘরে রয়েছে যেখানে রাখা আছে হিরোশিমা ও নাগাসাকির কিছু ধ্বংসাবশেষ। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল একটি হাত ঘড়ি, যেটিতে সময় আটকে আছে সেই ভয়াবহ ৮.১৫ মিনিটেই...

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ**